বাংলা ই-ত্রিপিটক
ই-বুকে রূপান্তর- জ্ঞানলোক ভিক্ষু
রাজবন বিহার, রাঙামাটি

বুদ্ধ যুগে বৌদ্ধ নারী

সংঘরাজ শীলালংকার মহাথেরো

বুদ্ধ যুগে বৌদ্ধ নারী

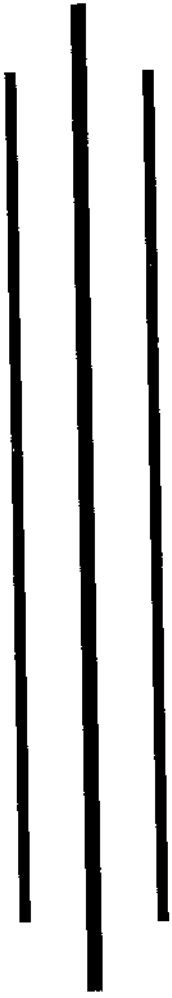

সংঘরাজ শীলালংকার মহাথেরো

প্রথম সংস্করণ ঃ ১৩৯৭ বাংলা
প্রবারণা পূর্ণিমা

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ ইং

তৃতীয় সংস্করণ ঃ ৬ই মাঘ ১৪০৭ বাংলা
১ লা অক্টোবর ২০০১ ইং

চতুর্থ সংস্করণ ঃ জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা
২২ শে জুন' ০৫ ইং

প্রকাশনায় ঃ শ্রীমৎ সুমনালংকার ভিক্ষু
রত্নাংকুর বন বিহার, নানিয়ারচর,
রাংগামাটি।

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ শ্রীমৎ সুমনালংকার ভিক্ষু
রত্নাংকুর বন বিহার, নানিয়ারচর,
রাংগামাটি।

সহযোগীতায় ঃ শ্রীমৎ সৌরজগত ভিক্ষু
শ্রীমৎ সুধর্মানন্দ ভিক্ষু
রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি।

প্রাপ্তিস্থান ঃ রত্নাংকুর বন বিহার, নানিয়ারচর, রাংগামাটি।
ফোন নং ঃ ০৩৫১-৬২৬৫২

মুদ্রণে ঃ রাজবন বিহার অফসেট প্রেস
ফোন ঃ ০৩৫১-৬২১৫৮।

গ্রন্থকারের কথা

'বুদ্ধ যুগে বৌদ্ধ নারী' মূলত কাহিনী ভিত্তিক জীবন গাঁথা। সুদীর্ঘ সময় এবং দীর্ঘ বিরতির পর আবার নব প্রয়াসের এক অনুপম সৃষ্টি পরিক্রমা এই গ্রন্থখানি। কলিকাতাস্থ ধর্মাধার বৌদ্ধগ্রন্থ প্রকাশনীর সুযোগ্য সম্পাদক ডঃ সুকোমল চৌধুরীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় এই গ্রন্থখানি প্রথম প্রকাশের আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছিলো।

আমারই স্নেহময় ও মৈত্রীময় আহ্বানে এই সময়ের শ্রেষ্ঠ প্রাণ পুরুষ বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতির সুযোগ্য সভাপতি বাবু রাখাল চন্দ্র বড়ুয়া মহোদয় আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন "বুদ্ধ যুগে বৌদ্ধ নারী" দ্বিতীয় বার প্রকাশের পাদ প্রদীপের উজ্জ্বলতা প্রদান করার জন্যে। সম্মানিত বাবু রাখাল চন্দ্র বড়ুয়া সম্পর্কে কি বলবো? তিনি বৌদ্ধ সমাজে সবার কাছে সুবিদিত বরেণ্য নেতা হিসেবে, দাতা হিসেবে এবং শাসন সদ্ধর্মের কল্যাণ মিত্র হিসেবে সুপরিচিত। সমাজে শাসন যখোন গ্রহণের কাল নেমে এসেছিলো, যখোন আমাদের প্রবহমান ঐতিহ্যে বেদনার্ত বিভ্রম নেমে এসেছিলো ঠিক তখোনি অতুলনীয় সাহসিক প্রত্যয়ে সকল ভাঙনের মোহনায় ঐক্য আর সংহতির সুদৃঢ় ভিত্ বিনির্মাণের জন্যে শার্দূলের ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়েছিলেন সম্মানিত বাবু রাখাল চন্দ্র বড়ুয়া মহোদয়। তাই আজ আমার শ্রমনিষ্ঠ ফসল 'বুদ্ধ যুগে বৌদ্ধ নারী' গ্রন্থের বাংলাদেশ সংস্করণ প্রকাশের ফুলেল সূচনায় আমি শাসন সেবক বাবু রাখাল চন্দ্র বড়ুয়া মহোদয়ের সুদীর্ঘ কর্মময় জীবন কামনায় পুণ্য দান করছি। সবার মঙ্গল হোক। বুদ্ধ শাসন চিরন্তন হোক।

শীলালংকার মহাথেরো
গ্রন্থকার

তারিখ ২৭ই সেপ্টেম্বর' ০১ইং
মির্জাপুর শান্তিধাম বিহার
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

আশীর্বাদ বাণী

তথা প্রযুক্তির বিকাশের সাথে সাথে মানুষের বুদ্ধি, চিন্তা দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটছে। সমাজের প্রয়োজনে মানুষ পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সহমর্মিতা ও সহযোগিতার মাধ্যমে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় আমাদের অবস্থান কোন পর্যায়ে রয়েছে, আজকে তা বিশ্লেষণের প্রয়োজন। শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও রাজনীতিতে আমাদের স্বাতন্ত্রের প্রতিফলন আছে কিনা তা ফিরে দেখা একান্ত প্রয়োজন। যদি ফিরে দেখি তাহলে অর্থের দাপটে জ্ঞান আজ নির্বাসিত, অভিজ্ঞতা আজ উপেক্ষিত। কেননা সমাজের সর্বত্র চলছে ধর্ম অনুশীলনের পরিবর্তে ধর্মানুষ্ঠান। তাই চিন্তার কোন অবকাশ নেই, নেতৃত্বে নেই উৎকর্ষতা। অহিংসা পরম ধর্মের ধারকরা গ্রহণ করছে প্রতিহিংসাকে ও দাম্ভিকতা পূর্ণ পরশ্রীকাতরতাকে। যার কারণে শোভন সাহিত্যময়ী প্রকাশনা ও এর কবল থেকে রক্ষা পায়না। জানিনা এতে কারা লাভবান হচ্ছেন। কিন্তু বৌদ্ধ জাতি হিসাবে আমরা হচ্ছি জাতির কাছে অপমানিত। তাই নতুন আঙ্গিকে প্রয়াত মহামান্য ৮ম সংঘরাজের অনবদ্য সৃষ্টিশীল রসমহিমাপূর্ণ "বুদ্ধ যুগে বৌদ্ধ নারী" গ্রন্থটি মির্জাপুর গ্রামজাত স্নেহভাজন এম. বোধিমিত্র ভিক্ষু ও কোটের পাড় পালি কলেজের সাবেক প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, ধর্ম প্রাণ উপাসক বিজয় কুমার বড়ুয়া গ্রন্থকারের ও তাদের পিতা-মাতার স্মরণে এবং জ্ঞাতীদের উদ্দেশ্যে/স্মৃতি তর্পণ করে পুনঃমুদ্রণের যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়। এই পুস্তকের বিক্রয় লব্দ অর্থ সংঘরাজের স্মৃতি ট্রাষ্টে ব্যয় করা হবে। কিন্তু ট্রাষ্টের সংবিধান যদি সংঘের কিংবা প্রকাশকের মনঃপুত না হয় তাহলে এই অর্থ সংঘরাজ ভিক্ষু মহামন্ডল ও শিক্ষা পরিষদে শর্ত সাপেক্ষে প্রকাশকদ্বয় ব্যয় করবেন।

(জ্ঞানশ্রী মহাথেরো)
অধ্যক্ষ
মির্জাপুর শান্তিধাম বিহার
কার্যকরী সভাপতি
প্রয়াত ৮ম সংঘরাজ শীলালংকার মহাথেরোর
জাতীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া
উদ্‌যাপনী পরিষদ।

সূচীপত্র

১। ত্রিশরণাপন্না ০১-২১
২। সুপ্রিয়া ২১-৩৭
৩। সুজাতা ৩৮-৪৫
৪। পটাচারা ৪৬-৮২
পরিশিষ্ট ৮৩-৮৪
৫। অম্বপালী ৮৪-৯৩
৬। সুমেধা ৯৩-১০২
পূর্বজন্ম ১০২-১০৭
৭। ইসিদাসী ১০৭-১১৫
৮। শুভা ১১৬-১২১

১। ত্রিশরণাপন্না

(১)

"নাম্, গাড়ি থেকে নাম্।"

"কেন, ব্যাপার কি? নাম্‌বো না আমি।"

নাম্‌বি না? আচ্ছা, "আমি তোকে নামাতে পারি কি-না দেখ্" বলে দণ্ডায়মান একটি যুবক গাড়িতে উপবিষ্টা এক সুন্দরী যুবতীর চুলের গোছা ধরে টান দিয়ে দুম করে ভূমির উপর বসিয়ে দিল।

অপ্রশস্ত সমতল ভূমি। এর চারপাশে খোলা বিজন অরণ্যানী। গহন অরণ্যের ঝিঁ ঝিঁ শব্দে প্রাণে শঙ্কার সঞ্চার হয়। অদূরে বিশাল এক বটতরু। ভূপৃষ্ঠে উপবিষ্টা কিং-কর্তব্যবিমূঢ়া এক আসন্ন-প্রসবা নারী সম্মুখে সম্ভ্রান্ত অথচ নির্মম-হৃদয় এক বলিষ্ঠ যুবক, পেছনে আরোহী-শূন্য এক গো-শকট, ঊর্ধ্বে অনন্ত নীলাকাশ, নিম্নে নিশ্চল মেদিনী।

যুবক-যুবতী উভয়ের মধ্যে কিছুকাল কথা কাটাকাটি হলো। যুবতী অনেক অনুনয়-বিনয় করে জিঘাংসায় উন্মত্ত যুবককে প্রকৃতিস্থ করবার চেষ্টা করল, কিন্তু, সুফল হবে বলে মনে হলো না।

যুবতী প্রসব বেদনায় অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়ল এবং অল্পক্ষণের মধ্যে তার একটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে যুবক শেষ-অস্ত্র নিক্ষেপের জন্য বস্ত্রাভ্যন্তর হতে ছোরা বের করতেই যুবতী সদ্য-প্রসূত শিশু সন্তানকে যুবকের পদপ্রান্তে রেখে দিয়ে পরিহিত রক্ত-রঞ্জিত বসনে নিজেও তার পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল।

(২)

শ্রাবস্তীর এক পল্লীগ্রাম। সেখানকার অনেক ধনাঢ্য পরিবারের মধ্যে অন্যতর এক পরিবার কর্তা, সুমন, পত্নী সুজম্পতিকে নিয়ে সংসার পেতেছেন। তাঁদের মিলনের কয়েক বৎসরের মধ্যেই ক্রমে ছেলে-মেয়ে দু'টি সন্তান তাঁদের সংসার আলো করল। বড় ছেলে সত্যব্রত, ছোট-মেয়ে সাধনা।[১]

---

[১]। পালিগ্রন্থে ছেলে-মেয়ের নাম উল্লেখ নেই, পাঠকদের সুখবোধের জন্য কল্পিত নাম ব্যবহার করা গেল।

সাধনার জন্মের কিছুকাল পরেই গৃহপতি সুমন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। স্বামীর মৃত্যুতে সুজম্পতি আঁধার দেখলেন। তিনি অবশ্য ভেঙ্গে পড়লেন না। কারণ সত্য ও সাধনাকে তাঁর মানুষ করতে হবে। স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মিলে যে বোঝা বহন করতেন, তা এখন একলাই তাঁকে বহন করতে হবে।

একযুগ পরের কথা। সত্যব্রত ও সাধনা অনেকটা বড় হয়ে কৈশোরে পা দিয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, এ বৎসর হতে সুজম্পতি দেবী রোগে শয্যা নিয়েছেন। অবশ্য তিনি বুঝতে পারলেন যে—এ শয্যা গ্রহণই তাঁর শেষ-শয্যা। আশা ছিল— ছেলে-মেয়ে দু'টিকে তিনি অনেক কিছু করে যাবেন, কিন্তু, তা করা বোধ হয় আর হয়ে উঠল না।

সব বুঝে তিনি সত্যব্রত ও সাধনাকে ডেকে তাঁর রোগ-শয্যায় বসিয়ে বললেন— 'মণি আমার, সংসার দুঃখময়-মানব মরণশীল। আমি এযাত্রা হয়তো আর বেঁচে নাও উঠতে পারি, তোদের হয়তো এবার চিরতরে ছেড়েই যাবো। চিন্তা নেই, আমার অভাবে শোক-দুঃখে তোরা ভাই-বোন উভয়ে ভেঙ্গে না পড়ে আমার অসম্পূর্ণ কর্তব্য পালন করে যাবি। তোদের ছন্নছাড়া জীবন দেখলে স্বর্গেও আমি শান্তি পাবো না।

এ কথা কয়টি বলতে সুজম্পতির আঁখি অশ্রুপূর্ণ হয়ে এল। তিনি আপনার ক্ষীণ-দুর্বল হাতে চোখ মুছে ফেল্‌লেন এবং মেয়ে সাধনার হাত সত্যব্রতের হাতের উপর রেখে বললেন- "সত্য আমার, এ সংসারে মাত্র তোরা দু'টি ভাই-বোন। তোর এ ছোট বোন সাধনাকে তোরই হাতে রেখে যাচ্ছি। সাধনা যে কতো সরল, তা তুইও জানিস্। তোর এ সরলা বোনকে তুই দেখিস্ স্নেহ করিস্, এর প্রতি যত্ন নিস্। এর সংসারে প্রবেশের পথ তোকেই করে দিতে হবে।"

এ কথা কয়টি বলতেই রোগিণীর অবশ হাত শিথিল হ'ল। তাঁর রোগপাণ্ডুর মুখে একটু হাসি খেলে যেতেই তিনি চক্ষু মুদিত করলেন চিরতরে। মৃতের মুখে কিন্তু প্রসন্নতার ছাপ রয়ে গেল। সত্য ও সাধনা নিরাশ্রয় হলো। তাদের শেষ-সম্বল মাতাকে হারিয়ে তারা ভাই-বোন শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ল।

পাঁচ-ছ'মাস পরের কথা। এখনো পর্যন্ত মায়ের কথা স্মরণ করে সাধনা সময় সময় কাঁদতে থাকে। ছোট বোনের অশ্রু সত্যব্রতকে

আকুল করে তোলে। কারণ, সাধনা দাদাকে কতখানি ভক্তি করে, ভলোবাসে, মমতার চোখে দেখে-মায়ের মৃত্যুর পর সে তার প্রমাণ পেয়েছে। দাদার সুখের জন্য, মঙ্গলের জন্য সাধনা না করতে পারে, জগতে এমন অসম্ভব কিছু নেই।

একদিন নিরালায় বসে কাঁদছে সাধনা। সত্যব্রত দেখে তাকে আদর করে বল্‌ল– "এতো কাঁদিস্ কেন বোন? তোর অশ্রু যে আমায় কতখানি ব্যথা দেয়, তা তুই বুঝবি না। মার অন্তিম কথা কি তুই ভুলে গেছিস্? মা যা বলে গেছেন– 'সংসার দুঃখময়, মানব মরণশীল'। মার এ শেষ কথাটি জীবনে ভুলিস্ না বোন, এতেই পাবি হৃদয়ে বল, মনে সাহস।"

সুখ-দুঃখের মধ্য দিয়ে ভাই-বোন দু'জনেরই দিন কেটে যায়। সত্যব্রত তার সরলমতি বোনকে সংসারের কাজে ও কথায় ভুলিয়ে রাখতে চায়। অবশ্য তার এ চেষ্টা অনেকাংশে সফলও হয়েছে। সে নিজে কিন্তু ভুলে থাকতে পারে না বোনের বিবাহের কথা। সাধনার সংসার প্রবেশের পথ তা'কেই যে করে দিতে হবে। অবশ্য, সত্যব্রত নিজেও বিবাহের উপযুক্ত হয়েছে; তবুও সে নিজের জন্য বিন্দুমাত্রও ভাবে না। সে কেবল বোনকে পাত্রস্থ করতে পারলেই বেঁচে যায়। এ হেতু, সে সাধনার অজ্ঞাতসারেই তার উপযুক্ত বরের অনুসন্ধানেই আছে।

এ বিষয় কিন্তু সাধনার অবিদিত রইল না। সে একদিন সত্যব্রতকে জিজ্ঞাসা করল– "দাদা, আমি কি তোমার খুবই বোঝা হয়েছি?"

সত্যব্রত সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল– "কেন বোন, আজ হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন? আমার কোন্ লক্ষণে প্রকাশ পাচ্ছে যে– আমি তোমায় বোঝা মনে করছি?"

"নয়-তো কি, তোমার সব কিছুতেই ব্যস্ততা নতুবা আমায় তাড়িয়ে তোমার কাছ ছাড়া করবার এতো প্রচেষ্টা কেন?"

সত্যব্রত বুঝতে পেরে বল্‌ল– "ও তাই, এ-তো তাড়ন নয় বোন-এ-যে মায়ের অন্তিম আদেশ রক্ষা করা, এ-যে তোর সুরক্ষার ব্যবস্থা করা বোন।"

"সম্প্রতি এ সুরক্ষার কাজ নেই, যেমন আছি-বেশ আছি। তোমায় একলাটি দুঃখে ফেলে, আমি কোথাও যেয়ে থাকতে পারবো না।"

"তা কি হয় বোন? সংসারী মানুষ, সংসারকে বুঝবার চেষ্টা কর্। মার অন্তিম বাক্য-তো আমি রক্ষা না করে পারি না, তা কি তুই জানিস্ না?"

"হ্যাঁ, আমি জানি, কিন্তু সে পরে হবে। এর আগে তুমি বিয়ে করে একটি সুন্দর বৌ ঘরে না আনলে, আমি কোথাও যাবো না।" বলে সে তার কাজে চলে গেল।

সত্যব্রতের ইচ্ছা ছিল-সম্প্রতি সে বিবাহ করবে না। কারণ, সে বিবাহ না করে আরও কয়েক বৎসর কাটিয়ে নিতে পারে। কিন্তু, তার বোন সাধনাকে তো আর বিবাহ না দিয়ে রাখা যায় না। যৌবন-লালিত্য তার সর্বাঙ্গে ফুটে উঠেছে– তার মুখমণ্ডলে, তার চক্ষে, তার হস্ত-পদে, তার কুঞ্চিত কেশরাশিতে, তার চলায়, তার সব কিছুতেই। কিন্তু, সাধনা তো সেদিন স্পষ্টই বলে দিলো যে– সত্যব্রত ঘরে বৌ না আনলে, সে স্বামী গ্রহণ করবে না। হ্যাঁ, সাধনাকে তো সে জানে, সে অবশ্য খুবই সরলা, কিন্তু সে যা একবার ধরে বসবে, তা না করে আর ছাড়বে না, তাই সত্যব্রত অগত্যা সিদ্ধান্ত করল যে-সে-ই প্রথম বিবাহ করবে। নতুবা সাধনাকে মানান যাবে না।

বিবাহের জন্য সত্যব্রতকে কোনও বেগ পেতে হলো না এবং সময়ের জন্য প্রতীক্ষা করতে হলো না। কারণ, মাতা-পিতার অবর্তমানেও সে যথেষ্ট অর্থের অধিকারী। কিছুদিনের মধ্যেই সে একটা বৌকে বরণ করে ঘরে আনল এবং বোন সাধনাকেও এক সুপাত্রে সম্প্রদান করে নিশ্চিন্ত হলো।

সত্যব্রত যাকে নববধূরূপে বরণ করে ঘরে নিয়ে এসেছে, সে কেমন হবে, তা বলা যায় না; কিন্তু, সাধনাকে যে সে সৎপাত্রে অর্পণ করতে পেরেছে, স্বর্গীয়া মার যে আদেশ রক্ষা করতে পেরেছে-এতে তার তৃপ্তির সীমা নেই। এতদিনে তার 'সত্যব্রত' নাম সার্থকতায় ভরে উঠল।

(৩)

সাধনার স্বামী অনুপম বেশ সুদর্শন যুবক। অনুপম বাস্তবিক অনুপমই বটে; রূপে-গুণে, জ্ঞানে-ধর্মে, ভক্তি-ভালবাসায় সব কিছুতেই সে অনুপম। সাধনার উপযুক্ত স্বামীই হয়েছে। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে একে অপরকে মনের মত করেই পেয়েছে।

দু'বৎসর পরের কথা। এর মধ্যে সত্যব্রত পিতৃত্বের গৌরব অনুভব করতে পারে নি। কিন্তু, সাধনা মাতৃত্বের গৌরব অনুভব না করলেও আসন্ন। এক অনাগত সুখ-স্বপ্নে সাধনার মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সন্তানের প্রতি মাতার যে অপরিমেয় স্নেহ-মমতা-করুণা, সাধনার অন্তরেও তা সঞ্চিত হয়ে উঠেছে ক্রমশঃ।

সাধনা তার আবির্ভাবকাল থেকেই পিতৃগৃহে দাদা ও বৌদির কাছে গিয়ে এ সঙ্কট ত্রাণের আশা করেই আছে। মাতা-পিতা বেঁচে না থাকলেও, দাদার আন্তরিক স্নেহ হতে সে বঞ্চিত হবে না, এ বিশ্বাস তার আছে। আর বৌদি– সে তো দাদারই অনুগামীনী। দাদার সহধর্মিণী হিসাবে সেও স্নেহ-মমতা না করে পারবে না। শত হলেও সে নারী, সে তার ভ্রাতৃবধু, সে তার বৌদিদি। বিশেষতঃ সাধনা তাদের দেখেছে– সে অনেকদিন।

এক সময় সাধনা স্বামীকে বল্‌ল– "চল না, একবার গিয়ে দাদা ও বৌদিকে দেখে আসি। অনেক দিন তাদের দেখিনি, আমার প্রাণ কেমন করে।"

অনুপম বল্‌ল- "চল না, মন্দ কি। আমার কোন আপত্তি নেই, থাকাও উচিত নয়।"

"যদি যাও, আজই চল।"

"আমি তো আগেই বলেছি যে আমার আপত্তি নেই।"

"যথাশীঘ্র প্রস্তুত হয়ে স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে সাধনা পিত্রালয়ে যাত্রা করল। পথিমধ্যে দেখতে পেলো– ভগবান গৌতম বুদ্ধ সশিষ্য ভিক্ষায় বের হয়েছেন। অনুপম ও সাধনার অন্তরে বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘ এ রত্নত্রয়ের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা। উভয়ে বুদ্ধের নিকটবর্তী হয়ে ভক্তি সহকারে বন্দনা করল। ভগবান তাদের ভাবী অবস্থা জ্ঞাত হয়ে উভয়কে ত্রিশরণ সহ পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠাপিত করে নিম্নোক্ত উপদেশ প্রদান করলেন–

১। "তোমাদের বিপদকালে সম্যক সম্বুদ্ধের শরণ নিও।

২। রাজ্যভয়, দস্যুভয় ও যক্ষ-প্রেতাদির উপদ্রব থেকে যদি রক্ষা পেতে চাও, তবে ভগবান তথাগতের শরণ নিও।

৩। সিংহ-ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর ভয় থেকে যদি রক্ষা পেতে চাও, তবে সম্বুদ্ধের শরণ নিও।

৪। রৌদ্র, বায়ু, অগ্নি ও জলভয় এবং ঋতুজ রোগাদি হতে মুক্তি লাভের ইচ্ছা করলে, সুগতের শরণ নিও।

৫। মৃত্যুর সঙ্গে যখন যুদ্ধ করবে, তখন মৃত্যুঞ্জয় ভগবান বুদ্ধের শরণ নিও, শরণ নিও ধর্ম ও সংঘের।"

শাস্তার ধর্মোপদেশ স্বামী-স্ত্রী উভয়েই একাগ্রমনে শুনল। ভগবান চলে গেলে তারা আবার সত্যব্রতদের বাড়ীর পথ ধরল। তারা অভীষ্ট স্থানে পৌঁছতেই সত্যব্রত ও তার স্ত্রী উভয়েই বের হয়ে তাদের গলাগলি করে আগু বাড়িতে নিল। আজ বহুদিনের পর দেখা, তাই এ চারজন নর-নারীর মধ্যে বহু সুখ-দুঃখের আলাপ হলো। স্ত্রীকে রেখে অনুপম পরদিন স্বগৃহে ফিরে এলো।

সত্যব্রত তার স্নেহের বোন সাধনার অন্তঃসত্ত্বাবস্থা জেনে, তার সেবা-যত্নের উপযুক্ত ব্যবস্থা করে দিল। তার স্ত্রীকেও বলে রাখল– "সাধনাকে যেন কোন প্রকার অসুবিধা ভোগ করতে না হয়।"

বৌদি ননদিনীর সকল প্রকার সেবা-পরিচর্যার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছে। স্নান ও খাওয়া-পরা প্রত্যেক বিষয়ে বৌদির দৃষ্টি না পড়লে, তা যেন সুচারুরূপে সম্পাদিত হয় না। বহুদিন পর তারা পরস্পরকে নিবিড়ভাবে পেয়ে মনের মত মিলনের সুযোগ পেল এবং এ মিলনের ফলে তাদের মধ্যে সখীত্বের সৃষ্টি হলো।

(৪)

দিনের পর রাত, রাতের পর দিন চলে যায়। কিন্তু এই সখ্যতার মধ্যেও সাধনার প্রতি বৌদির কেমন যেন একটা মানসিক দূরত্বের সৃষ্টি হয়। এর একমাত্র কারণ– ননদিনীর অভিনব ধরণের গড়া বহুমূল্য স্বর্ণালঙ্কার। সাধনার এ বিচিত্র স্বর্ণালঙ্কার বৌদির সুখ-পথের কন্টক হয়ে দাঁড়িয়েছে, তার নারী-জীবনকে নিষ্ফলতায় পর্যবসিত করতে বসেছে। আজীবন তার কোন সন্তান না হোক্, আজীবন সে মাতৃত্বের

গৌরব থেকে বঞ্চিত থাকুক ক্ষতি নেই, কিন্তু সাধনার মনোরম অলঙ্কার থেকে সে বঞ্চিত থাকবে– এটা তার জীবনে সহ্য হবে না।

স্ত্রীলোকেরা সাধারণতঃ নিত্য নতুন অলঙ্কার পরতেই অধিক ভালোবাসে। ভোগৈশ্বর্যে ডুবে থাকলেও অলঙ্কার যদি একপদ কম হয়, অথবা বৈচিত্রহীন হয়, তা হলে তাদের জীবন যেন বৃথা গেল। অলঙ্কারের প্রাচুর্যে তাদের তৃপ্তি মিটে না; যত পায়-তত চায়। এমন কি, মনের মত করে অলঙ্কার পরতে পেলে, কোন কোন নারী পুত্রশোকও যে ভুলতে পারে এরূপ দৃষ্টান্তও দেখা যায়।

ভ্রাতৃবধূর অলঙ্কারের অভাব না থাকলেও, সাধনার হাতে দেখা নতুন ধরণের অলঙ্কার প্রাপ্তির বলবতী ইচ্ছা তাকে পেয়ে বস্‌ল। তার সে অতৃপ্ত বাসনা এমন প্রবলভাবে বৃদ্ধি পেল যে, তার পক্ষে তা অসহনীয় হয়ে উঠল।

কিছুদিন থেকে এ দুরাকাঙ্খার বিষময় জ্বালার মধ্য দিয়েই তার দিন অতীত হতে লাগল। তার পূর্বের সে শান্তি নেই, সে স্বাচ্ছন্দ্য নেই, সে উৎসাহ নেই–আছে কেবল সুরহারা, ছন্দহীন, ভাবশূন্য ব্যথা-ভারাক্রান্ত দুঃসহ জীবন।

স্বামী সত্যব্রতের অর্থের তেমন অভাব নেই। স্ত্রী ইচ্ছা করলে, স্বামীকে বলে সে'ধরণের অলঙ্কার অনায়াসে গড়িয়ে নিতে পারতো। কিন্তু সে তা চায় না-চায় সাধনারই অলঙ্কার।

আজ তার মোটেই ভাল লাগ্‌ছে না। সত্যব্রত প্রতিদিনের মতো আজ প্রাতেও কর্মস্থলে চলে গেছে। দুপুরে অবশ্য খেতে আসবে। তার বের হয়ে যাবার পর থেকেই স্ত্রী শুয়ে পড়েছে। সাধনা পূর্ব হতেই লক্ষ্য করে আসছে বৌদির বিমর্ষভাব। আজ কিন্তু তাকে শয্যা নিতে দেখে এর কারণ জানতে চেয়েছিল সে। নরম-গরম প্রত্যুত্তর পেয়ে ব্যথিত চিত্তে সে ফিরে এলো।

দুপুরে সত্যব্রত খেতে এলো। স্ত্রীর দেখা না পেয়ে সাধনাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারল, সে কি– জানি কেন শুয়ে আছে। সত্যব্রত খেয়ে উঠে শোবার ঘরে গিয়ে দেখে-স্ত্রী সত্যই শুয়ে আছে। স্ত্রীর গায়ে হাত রেখে জিজ্ঞাসা করল-- "ঘুমিয়েছ কি?"

স্ত্রী কোনো উত্তর না করে কেবল পাশ ফিরেই শুলো। সে আবার জিজ্ঞাসা করল– "অসময়ে শুয়ে আছ কেন, কোনো অসুখ করে নি তো?"

উত্তর হলো "না।"

"তবে শুয়ে আছ কেন?"

"কেন, এ প্রশ্ন এতদিনে বুঝি? মাগো, পুরুষ মানুষ নারীর উপর এতখানি অবিচার করতে পারে!"

"কি, হয়েছে কি? খুলে বলো না কেন? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।"

বুঝতে হবে না, না বোঝাই ভালো, খুলে বলায় কাজ নেই।"

"তবে তুমি আমায় অবিশ্বাস কর? আমার ভালোবাসার কোনও মূল্য নেই?"

"তোমার ভালোবাসার প্রমাণ তো খুবই পাচ্ছি।"

"বলো দেখি, তোমার কি করলে ভালোবাসার প্রমাণ দেওয়া যায়?"

"বলে কাজ নেই, সে তুমি পারবে না।"

"পারবো না? নিশ্চয়ই পারবো, প্রাণপণ চেষ্টা করবো।"

"সত্যি?"

"সত্যি।"

"তবে প্রতিজ্ঞা করো কাউকে বলবে না।"

"প্রতিজ্ঞা! হ্যাঁ, প্রতিজ্ঞা করলাম, কাউকেও বলবো না।"

এ নরপিশাচিনী নারী কিন্তু সাধনার অলঙ্কার আত্মসাতের লালসা সম্প্রতি গোপন রাখল। এ অলঙ্কার সে পেতে চায় স্থায়ীভাবে। তা করতে হলে, সাধনাকে এ পৃথিবী থেকে চিরতরে সরিয়ে দিতে হবে। এ দুর্বুদ্ধি এঁটে সে বল্‌ল– আমি সাধনার হৃৎপিণ্ড চাই। হয় বাসনা পূর্ণ করো, না হয় আমার মৃত্যু-পথ প্রশস্ত করো।"

সত্যব্রত স্ত্রীর মুখে এমন নিষ্ঠুর-লোমহর্ষকর কথা শুনে শিউরে উঠল, বিস্ময়ে বিস্ফারিত হলো চক্ষু, ললাট কুঞ্চিত হলো, চোখে অন্ধকার দেখলো।

স্বামীর অবস্থা দেখে পত্নী বলল– "এ-ই তো, আমি কি বলি নি সে তোমার দ্বারা হবে না?

সত্যব্রত একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে বল্‌ল- "হ্যাঁ, ঠিকই বলেছো, হবে না। ভাই হয়ে ছোট বোনকে হত্যা করা! অসম্ভব, তা হবে না। জানতে পারি, তোমার এমন নির্মম দুর্বাসনার কারণ-কি?"

"দুর্বাসনার কারণ? 'দুর্বাসনা' আমি বুঝি না, আমি বুঝি শুধু– 'কারণ'। কিন্তু, সে কারণ পরে হবে। আগে বলো, সাধনাকে হত্যা করে তার সদ্য হৃৎপিণ্ড দিয়ে আমায় বাঁচাতে চাও কি না?"

সত্যব্রত আবার শিউরে উঠল। স্ত্রীর রাক্ষসীমূর্তির দিকে চেয়ে সে প্রমাদ গুণল; তার মুখ হয়ে গেল ফ্যাকাসে। বল্‌ল গাঢ় স্বরে-"বাঁচাতে? হ্যাঁ, তোমায় বাঁচাতে চাই, কিন্তু আমার একমাত্র স্নেহের বোন সাধনার হৃৎপিণ্ড দিয়ে নয় আর যা দিয়ে পারি তোমায় বাঁচাতে চেষ্টা করবো, প্রাণপণ চেষ্টা করবো। তোমার কি হয়েছে বলো। একটু স্থির হও, চিন্তা করে দেখো– তুমি কি বলছো মনে হয়, তুমি বিভ্রান্ত হয়েছো।"

"বিভ্রান্ত! কে বিভ্রান্ত, আমি? না, আমি ঠিকই আছি। বলো, তোমার প্রতিশ্রুতি তুমি রক্ষা করবে কি না?"

"না, আমার প্রতিশ্রুতি এর জন্য নয়। সে প্রতিশ্রুতি এমন নিদারুণ নয়। সে যে আমার একমাত্র স্নেহময়ী বোন, সে যে তোমার প্রিয়সখী-ননদিনী সে যে পরের স্ত্রী, সে যে অন্তঃসত্ত্বা, সে যে আমার মরণ-পথ যাত্রী মায়ের দান। না, না, তোমার এ দারুণ পাপ-বাসনা আমি পূর্ণ করতে পারবো না, ভাই হয়ে বোনের হন্তারক সাজতে পারবো না।" এসব কথা বলতে বলতে সত্যব্রতের চোখ অশ্রুসিক্ত হলো।

স্ত্রী ভ্রূকুঞ্চিত করে তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে বলল– "পারবে না? তবে কি তুমি আমার মৃত্যুই কামনা কর?"

"আমি কারো মৃত্যু কামনা করি না। তুমি স্বেচ্ছায় যদি মৃত্যুকে ডেকে আনো, আমি কি করবো?"

স্বামীর একথায় স্ত্রী রুখে উঠে বল্‌ল– "নিষ্ঠুর–পাষাণ, এ বুঝি আমার প্রতি তোমার ভালোবাসা? এ ছাই ভালোবাসা আমি চাই না। যাও, এখান থেকে চলে যাও। আমার পথ আমি দেখবো। তবে মনে রেখো–আমার এ মৃত্যুর জন্য একমাত্র দায়ী তুমিই।" এ বলে সে পাশ ফিরে শুলো।

স্ত্রীর এ জঘন্য ব্যবহারে সত্যব্রত সত্যই ব্যথিত হলো। সে কিছুক্ষণ পাপাভিমানিনী পত্নীর দিকে চেয়ে থেকে চকিতে বেরিয়ে চলে গেল। রাত্রে আহারের সময় সে বাড়ী ফিরল। বোন সাধনা তাকে ভাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করল– "বৌদির আজ কি হয়েছে দাদা? কয়দিন থেকে তা'কে বিমনা দেখাচ্ছে, আজ কিন্তু সকাল থেকেই একেবারে শয্যা নিয়েছে। আমি তাকে অনেক অনুনয় করলেও কিছু হলো না। তাকে আজ তুলতেও পারলাম না, খাওয়াতেও পারলাম না। দাদা, বৌদি তোমায় কিছু বলল না?"

সত্যব্রত জানে–সাধনা চিরকালই সরলা। সে এর কিছুই জানে না এবং বুঝে না। সত্য গোপন করে সে বল্‌ল– "কি জানি সে যে কিছুই বলে না। কয়েক গ্রাস ভাত তাড়াতাড়ি খেয়েই তাকে উঠতে দেখে সাধনা বল্‌ল– "কি দাদা, খাবার সব রেখে এতো তাড়াতাড়ি উঠে পড়লে যে?"

"আজ তেমন ক্ষুধা নেই।" বলে সে বেরিয়ে গেল।

(৫)

পত্নী-প্রিয় ধরণের লোক সত্যব্রত। যে কোনো প্রকারে হোক-স্ত্রীর সন্তোষ বিধানের মাধ্যমেই তার কর্তব্যের মর্যাদাকে সে অক্ষুণ্ন রাখতে চায়। কিন্তু, এমন বিপদে সত্যব্রত আর কোনদিন পড়েনি। তার ব্যথা-ভারাক্রান্ত মন আসন্ন বিপদের শঙ্কা-দোলায় দোলায়মান। একদিকে প্রিয়পত্নীর জীবনাশঙ্কা অন্যদিকে আদরের স্নেহশীলা বোনের হত্যাশঙ্কা। এ দুই আশঙ্কায় সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল।

আবার সত্যব্রত ভাবে– "না, সাধনার জন্য আমার শান্তি-প্রস্রবণ পত্নীকে আত্মহত্যা করতে দিয়ে আমি শান্তিহারা হতে পারবো না। সে'ই যে আমার শান্তি, সে'ই যে সুখ, সে'ই যে আমার আনন্দ। দুর্বহ হয়ে উঠবে আমার শান্তিহারা জীবন।

আর সাধনা– সে তো অমর নয়, তার জন্য আমার প্রেম-মন্দাকিনী কেন শুকিয়ে যাবে? সাধনা মরবে। আজ না মরে-দু'দিন পরে মরবে। তবে কেন তার জন্য আমার সুখ-শান্তিকে চির-নির্বাসন দেবো? সাধনা রোগে না মরে-ছোরার বিষে মরবে, অন্যের হাতে হত না হয়ে-ভাইয়ের হাতেই হত হবে, এ'ই তো বিশেষত্ব? এতো ভাবলে আর চলে না।"

দুপুর রাত্রি। চারদিক ঝিম্ ঝিম্ করছে। সত্যব্রত আস্তে আস্তে পত্নীর ঘরে গেল। দেখল–সে ঘুমায় নি। পত্নীরত্নটি বসল সহধর্মিণীর পাশে। গায়ে একখানা হাত রেখে বল্‌ল মৃদুস্বরে– "প্রিয়ে, তোমার বাসনাই পূর্ণ করবো। তুমি নিশ্চিন্ত হও। সিদ্ধান্ত করেছি– সাধনার জন্য তোমায় হারাতে পারবো না। তুমি আমার অমিয়-নির্ঝরিণী।"

স্ত্রীর মুখমণ্ডল কপট-গাম্ভীর্যপূর্ণ। বল্‌ল ভ্রূকুঞ্চিত করে- "হয়েছে, রাত-দুপুরে আর ন্যাকামি করতে হবে না। মিথ্যা–প্রবোধে আমায় ভুলাতে পারবে না। এসেছো-স্তুতি বাক্যে আমার মন যোগাতে!"

'মিথ্যা প্রবোধ নয়, একান্ত সত্য। এর প্রমাণ পাবে কাল, দেখবে–তার সদ্য হৃৎপিণ্ড এনে তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি।"

সত্যব্রত স্ত্রীর কিরূপ বশীভূত, কেমন আসক্তি-পরায়ণ, স্ত্রী তা ভালরূপে অবগত আছে। সে জানে স্ত্রী হিসাবে স্বামী তাকে কোনো দিনই বিমুখ করতে পারবে না। এ কথা মনে পড়তেই সে উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

পত্নী-অনুরক্ত স্বামী পত্নীর জন্য করতে পারে না, জগতে এমন কাজ খুবই বিরল। যে স্বামী স্ত্রীর বশীভূত, তার দ্বারা স্ত্রী ষোল আনার উপর আঠার আনা অমঙ্গলের পথ প্রশস্ত করে নেয় সোনার সংসার, মিলন-মন্দির অন্তর্দ্বন্দ্বের তীব্র আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায়। সে কী ভয়ঙ্করী স্ত্রীবুদ্ধি, কী মোহিনী শক্তি-যার কলঙ্ক-মলিন প্ররোচনায় প্ররোচিত হয়ে পুরুষ পথভ্রষ্ট হয়, বিষময় করে তোলে মধুময় জীবনকে। অদৃষ্টের এ-কি পরিহাস!

একটি মাত্র নারীর মন্ত্র-শক্তিতেই ভ্রাতায়-ভ্রাতায় বিরোধ, পিতা-পুত্রে বিচ্ছেদ, পরস্পর পরস্পরে কলহ-বিবাদ, তিক্ত স্বার্থপরতা, এমন কি হত্যা ষড়যন্ত্রও হয় সংঘটিত। এ কারণে বিজ্ঞজন বলে থাকেন–

১। যে ব্যক্তি স্ত্রীর বশীভূত হয়, সে তার ইহ-পরকাল নষ্ট করে, মহান উদ্দেশ্য তার ব্যর্থ হয়ে যায়।

২। যে ব্যক্তি স্ত্রীর বশীভূত হয়, মাতা-পিতা ও ভ্রাতা-ভগ্নীর প্রতি তার গৌরব-সম্মান লুপ্ত হয়ে যায়, তাদের প্রতি অন্যায় অত্যাচার, এমন কি তাদের হত্যা করতেও সে কুণ্ঠিত হয় না।

৩। যে ব্যক্তি স্ত্রীর বশীভূত হয়, কামতৃষ্ণা হেতু তার কর্তব্যাকর্তব্য-জ্ঞান লুপ্ত হয়ে থাকে।

৪। যে ব্যক্তি স্ত্রীর বশীভূত হয়, প্রাণীহত্যাদি এমন কোনো অকরণীয় দুষ্কর্ম নেই, তার দ্বারা যা সম্পাদিত হতে পারে না।

৫। যে ব্যক্তি স্ত্রীর বশীভূত হয়, চুরি, মিথ্যাভাষণ, মদ্যপান ও পিশুনাদি সমস্ত দুঃসাহসিক কাজই তার দ্বারা সম্পাদিত হতে পারে।

(৬)

সম্পূর্ণ ভোর না হতেই প্রভাতী পাখীর কাকলীতে সাধনার নিদ্রা ভেঙ্গে গেল তখনও পৃথিবীর বুক অন্ধকারে ছেয়ে আছে। এতো সকালে সাধনা শয্যা ছেড়ে না উঠে বিছানায় পড়েই রইল। কিন্তু, এ সময় কত শত কথা মনে উদিত হয়ে আকুল করে তুল্‌ল তাকে। সে ভাবে– "তার সন্তান আবির্ভাবের দশমাস পূর্ণ হতে চল্‌ল। সন্তান আজ আসে কি কাল আসে- তার সঠিক কিছু বলা যায় না। কিন্তু, মাতৃত্বের গৌরবে তার নারী হৃদয় যে এবার ভরে উঠবে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। স্বামী কখন সন্তানকে দেখ্‌তে পাবে, তার সাধনার নবাগত অতিথির কি নাম রাখবে, তার দেওয়া নাম সন্তানের পিতার পছন্দ হবে কি না" এসব বিষয়ে চিন্তা করতে সে উঠে পড়ল।

সবে মাত্র প্রভাত হয়েছে। সত্যব্রতের স্ত্রী কিছুদিন যাবৎ মানসিক অস্বস্তির দরুণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও আপন করণীয় কাজ সম্পাদন করলেও, কিন্তু গতকাল থেকে সে যে গোঁ ধরে দিন-রাত শুয়ে আছে, এতে আসন্ন-প্রসূবা ননদিনীর সেবা-যত্নের কথা দূরে থাক্, উপরন্তু ননদিনীকে সম্পাদন করতে হচ্ছে-যা না করলে নয়, এমন সাধ্যায়ত্ত দু'একটা কাজ।

সকালেই দাদার প্রাতরাশের বন্দোবস্ত করে দিল। সত্যব্রত তার খাওয়া শেষ হতেই সাধনাকে ডাকল। সে এসে জিজ্ঞাসা করল- "কি দাদা, আমায় ডেকেছো?"

"হ্যাঁ, বলি শোন্-মা যে সেবার কয়েকজন লোককে সরল বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে অতগুলি টাকা হাওলাত দিলেন, তা কি তোর মনে পড়ে?"

সাধনা আশ্চর্য ও চিন্তিত হয়ে বল্‌ল– "না দাদা, কই মা'র এমন টাকা ধার দেওয়ার কথা তো আমার মনে পড়ছে না।"

অগ্রজের কপটতায় ভ্রাতৃপ্রেম-মুগ্ধ সাধনার পক্ষে সন্দেহ করবার মতো কিছুই থাকতে পারে না। কারণ, সরলা সাধনা-শিশুকাল থেকে সরলতারই যেন সাধনা করে আস্‌ছে ।

সত্যব্রত বল্‌ল– "হ্যাঁ, তোর মনে না পড়ারই কথা। কারণ, তখন তুই খুবই ছোট ছিলি কি-না। আমি কিন্তু, শত-চেষ্টা করেও এযাবৎ তা আদায় করতে পারছি না। টাকাগুলি মাটি হতে বসেছে। চল্ আজ আমরা ভাই-বোন দু'জনেই গিয়ে দেখি। হয়তঃ আমাদের দেখলে পাওনা টাকা তারা চুকিয়ে দেবে।"

সরলা সাধনা এর কিছুই বুঝতে পারল না। সে কেবল নিজের পূর্ণ-গর্ভাবস্থার কথা ভেবে বলল– "আমরা এ অবস্থায় আমি কি করে যাই দাদা?

"গো শকটে যাওয়া যাবে। তা'তে তোর কোনো অসুবিধা হবে না। অল্পক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসবো।"

বলা বাহুল্য, গতকল্য রাত্রেই সত্যব্রত গো শকটের জন্যে বলে রেখেছিল। দাদার আদেশ সাধনা জীবনে কখনও লংঘন করতে পারে নি। আজও পারল না। সুতরাং তারা ভ্রাতা-ভগ্নী উভয়ে গো-যানে যাত্রা করল। শকট রাস্তা বেয়ে অগ্রসর হলো। ক্রমে শ্রাবস্তীর পল্লী-প্রান্তর অতিক্রম করে অরণ্যের পথ ধরল। সাধনা তখন পর্যন্তও বুঝতে পারল না যে- সত্যব্রতের মনে কোনো প্রকার অসত্যের ছাপ থাকতে পারে। গাড়ী তাদের নিয়ে জনশূন্য বনে প্রবেশ করতে দেখে সাধনা জিজ্ঞাসা করল– "এ-যে গহন অরণ্য দাদা, আমরা এ পথে কোথায় যাবো?"

সত্যব্রত অবিচলিত কণ্ঠে বল্‌ল– "কোথা যা-বো? আমি যাবো-জীবনের পথে, আর তুই যাবি–মরণের পথে।"

সাধনা আশ্চর্য হয়ে বল্‌ল– "এ-কি বলছো দাদা? এখানে আসবে কেন জীবন-মরণের কথা? আমি যে এর কিছুই বুঝতে পারছি না! আমরা কি মার লগ্নীকৃত অর্থ আদায় করতে যাবো না?"

"ঋণের অর্থ আদায়! মিথ্যা কথা, সত্য হলেও অর্থ সামান্য বিষয়, কিন্তু তার চেয়েও যা অসামান্য, আমি সেই অশান্তির শোধ নিতে চাই- তোকে হত্যা করে।"

সরলা সাধনা শিউরে উঠে বল্‌ল– "হত্যা! আমায় হত্যা করবে?" তোমার পায়ে আমি কোন্ অপরাধে অপরাধিনী যে, আমায় হত্যা করবে দাদা?"

"রেখে দে তোর দাদা সম্বোধন, এখন আমি তোর দাদা নই। বোনের জন্য যে স্নেহের উৎস বিরাজ করে দাদার বক্ষে, আমার এ তপ্ত বক্ষে তা নেই, হিংসার তীব্র দাহনে নিঃশেষে শুকিয়ে গেছে আমার সে স্নেহের উৎস। কিছুক্ষণ এরূপ কথা কাটাকাটি চল্‌ল। গো-শকট আরো কিছুদূর সম্মুখে অগ্রসর হলো ।

"বল্‌ল– "এসব যে কি বলছো দাদা, তার কিছুই আমি বুঝতে পারছি না। আমি তো কোনো অপরাধ করিনি দাদা! আর যদি নির্বিচারে অপরাধিনী বলে আমায় সাব্যস্ত করে থাকো, তবে আমায় হত্যা করো-ক্ষতি নেই; কিন্তু আসন্নজন্মা নিরপরাধ আমার গর্ভস্থ যে সন্তান- তার দোষ কি? সে তো অপরাধী নয়, আমার অপরাধে সে কেন মৃত্যুদন্ড ভোগ করবে?"

সাধনার ক্রন্দন ও এমন কাতর আবেদনও নিষ্ঠুরের কোনো ভাবান্তর দেখা গেলনা। সে যেন পাষাণে বুকে বেঁধেছে। অসহায়া নারীর কাতরোক্তির দিকে তার বিন্দুমাত্রও ভ্রূক্ষেপ নেই, তার যে জঘন্য উদ্দেশ্য এখনো সিদ্ধ হয় নি। মঙ্গলের জন্য হোক বা অমঙ্গলের জন্য হোক-উত্তাল-তরঙ্গায়িত অকূল সাগরে ভাসমান অসহায়া সাধনা জিঘাংসু পাষন্ডের হাত থেকে নিস্তার না পেতেই তার প্রসব বেদনার সঞ্চার হলো। দুঃখ আর কত সহ্য করা যায়! প্রসবের পূর্বে সত্যব্রতের হাতে সে নিহত হলে, অন্ততঃ প্রসব যন্ত্রণা হতে সে বেঁচে যেতো। কিন্তু, তা হয় না, তার ব্যথার বোঝা তা'কেই বয়ে যেতে হবে।

সাধনা প্রসব বেদনায় অস্থির হয়ে সত্যব্রতকে বল্‌ল– দাদা, বলতে লজ্জা হয়, কিন্তু না বলেও উপায় নেই– আমার সন্তান প্রসবের সময় এসেছে, প্রসব-বেদনায় আমি অস্থির হয়ে পড়েছি। একান্তই হত্যা

করলে, প্রসবকাল পর্যন্ত আমায় সময় দাও, নারী হয়ে যুগপৎ দ্বিবিধ যন্ত্রণা আমি সহ্য করতে পারবো না।

এসব কথা নিষ্ঠুরের কানে গেল না। সেদিকে তার লক্ষ্য নেই, সে চায় তার দুর্দান্ত বাসনা চরিতার্থ করতে। ন্যায়ের কাছে সত্যব্রত অস্থির হয়ে উঠলেও এতো দুর্দৈবের মধ্যেও সাধনা ছিল স্থির; সেই অসীম স্থৈর্য্যের মধ্যে সাধনা প্রসব করল–এক সুন্দর পুত্র সন্তান।

সদ্য প্রসূত শিশুসন্তানকে দেখিয়ে নির্দয় ভ্রাতাকে প্রকৃতিস্থ করবার আশায় সাধনা বল্‌ল– "দাদা, তোমার এ নিরপরাধ ভাগিনার মুখ চেয়েও কি আমায় ক্ষমা করতে পারোনা? এ অবোধ শিশুর মুখও কি তোমার প্রাণে দয়ার সঞ্চার করতে পারে না? আমি অভাগিনী মা ব্যতীত এ অসহায় শিশুকে রক্ষা করে মানুষ করবার যে আর কেউ নেই; আমার অভাবে এ কুসুমকলি যে কোরকেই শুকিয়ে অকালে ঝরে পড়বে। তোমার ছোট বোনের শেষ অনুরোধ রক্ষা করো দাদা! আমার প্রাণ ভিক্ষা দিয়ে সুযোগ দাও একে বাঁচিয়ে তুলবার।"

কিছুতেই কিছু হলো না। রক্তোল্লাসী সত্যব্রতকে সাধনা কিছুতেই প্রকৃতিস্থ করতে পারল না। এ পাষন্ড অধৈর্য হয়ে উঠল। তার শেষ অস্ত্র নিক্ষেপের জন্য বস্ত্রাভ্যন্তর হতে শাণিত ছুরিকা বের করতেই অসহায়া সাধনার স্মরণ হলো মহাকারুণিক বুদ্ধের করুণাঘন উপদেশ-অশরণের শরণ-ত্রিশরণ। তখন সাধনা আকুল কণ্ঠে বলে উঠল–

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি– আমি বুদ্ধের শরণাপন্না হচ্ছি,
ধম্মং সরণং গচ্ছামি– আমি ধর্মের শরণাপন্না হচ্ছি,
সংঘং সরণং গচ্ছামি– আমি সঙ্ঘের শরণাপন্না হচ্ছি।

যুগপৎ রত্নত্রয়ের গুণ স্মরণ করতে করতে সদ্য-প্রসূত শিশু-সন্তানকে সত্যব্রতের পদপ্রান্তে রেখে দিয়ে গর্ভমল-রঞ্জিত-বসনা সাধনা আর্তকণ্ঠে কেঁদে উঠে তার পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল।

তখনি অদূরে- সম্মুখে হঠাৎ সাধনার স্বামীর বজ্রগম্ভীর সাবধান-বাণী শুনে সত্যব্রত চমকে উঠতেই তার মুষ্ট্যাবদ্ধ ছুরিকা হস্ত থেকে খসে পড়ল। শুনল সে– "কে রে নরাধম-পাষন্ড, বোনের প্রতি তোর এ অবিচার! দাঁড়া, এখনি এর সমুচিত শিক্ষা দিচ্ছি।" তা শুনেই

সত্যব্রতের সর্বাঙ্গ থরথর কেঁপে উঠল, ভীত-ত্রস্তপদে দৌড়ে সে গভীর অরণ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সাধনা সঠিক জানতে পারে নি– নিষ্ঠুর সত্যব্রত তার পৃষ্ঠদেশে ছোরা বসিয়েছে কি না। কারণ, মৃত্যু-বিভীষিকায় তখন তার কোমল-দুর্বল-তনু-মন সমাচ্ছন্ন। পরে সাধনা একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে বুঝতে পারল যে-সে ছুরিকাহত হয়নি। হলে, নিশ্চয়ই অনুভূত হতো তার শরীরে যন্ত্রণা। তবে এ মৃত্যুর হাত থেকে যে সে বেঁচে গেল-তা অন্য কারণে নয়, এতমাত্র তার অনাবিল ভ্রাতৃপ্রেম এবং সর্বজ্ঞ তথাগতের তথা ধর্ম ও সংঘের অতুলনীয় গুণপ্রভাবে। ত্রিরত্নের অপার মহিমার কথা মনে পড়তেই সাধনা আবার বিষয়াবিষ্ট অন্তরে মস্তক অবনমিত করল বন্দনা- নিবেদনের উদ্দেশ্যে।

(৮)

সাধনার এই জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে যাঁর আবির্ভাবে ব্যর্থকাম সত্যব্রত গহন-অরণ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল–সে সাধনার স্বামী অনুপম নয়। তিনি অনুপমরূপী ছদ্মবেশী এক দেবপুত্র। সত্যব্রত সাধনাকে লক্ষ্য করে যে অমানুষিক কার্যে অগ্রসর হয়েছিল, দেবতার দেব-হৃদয়ে তা সহ্য হলো না। এমন এক মৈত্রীপরায়ণা ও ত্রিরত্নের শরণাপন্না নিরপরাধিনী নারী তাঁরই দিব্য-দৃষ্টির মধ্যে অবমানিত ও নিহত হবে, দেবতার প্রাণে তা সহ্য হলো না।

সাধনার স্বামীরূপী ছদ্মবেশী দেবপুত্রকে মানবী সাধনার চিনতে পারার কোনো উপায় নেই। দেবতার সাবধান বাণী শোনামাত্রই সত্যব্রত পালিয়ে বাঁচল। তড়িৎবেগে দেবতা এসে ভূমিতে অবলুণ্ঠিতা সাধনাকে বল্‌লেন– "ভয় নেই, ভয় নেই, এই যে আমি– ওঠো।"

স্বামী অনুপমের কণ্ঠস্বর শুনে সাধনা কম্পিত কলেবরে উঠে বস্‌ল এবং ভীত-চকিতনেত্রে দেখতে লাগল চারিদিকে। সম্মুখে দেখল অনুপম বেশী সেই দেবপুত্রকে। সে তখন আর্তকণ্ঠে কেঁদে উঠে বল্‌ল– "তুমি! তুমি এসেছো! বাঁচাও প্রিয়তম। আমাকে বাঁচাও; রক্ষা করো তোমার বাছাধনকে, দুধের শিশুকে।" একথা বলতেই রমণী মুর্চ্ছিতা হয়ে ঢলে পড়ল।

দৈবশক্তির প্রভাবে অল্পক্ষণের মধ্যে সাধনার সংজ্ঞা ফিরে এলেও তার চোখে মুখে এখনও পরিস্ফুট হয়ে রয়েছে ভয়-বিভীষিকার ছাপ। ভীতি-বিহ্বল কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করল— "আমার দাদা কোথায়?"

ছদ্মবেশী দেবতা উত্তর করলেন— "তোমার দাদা! এখনও তা'কে দাদা বলছো! সে পাষন্ড পালিয়ে গেছে। আর কোনো ভয় নেই।"

"প্রিয়তম, দাদা আমার এমন ছিলো না। আমার প্রতি ছিল তাঁর অগাধ স্নেহ। সাধনা বলতে-তার স্নেহ, মমতা, আদর ঝর্ণার মতো ঝরে পড়তো। আমার এ দেহ তার স্নেহ-পুষ্ট, একমাত্র তারই দয়ায় আমি লাভ করেছি তোমার মতো দেবদুর্লভ স্বামী। সে নয়, তাকে প্ররোচিত করেছে, নিয়োজিত করেছে তার শয়তানী-নরপিশাচী স্ত্রী। বলো প্রিয়তম, আমার স্নেহময় দাদা নিরাপদে আছে তো?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ আছে। আর বলো না সে ভগ্নীদ্রোহী-পাতকীর কথা। এখন চলো ঘরে ফিরে যাই।"

"হ্যাঁ, যাব প্রিয়তম, আমিও যেতে চাই; এখানে আর কিছুক্ষণ থাকলে, আমি বাঁচবো না।"

অনুপমরূপী দেবতা সাধনাকে হাত ধরে গো-শকটে তুলে দিলেন। দেবতার দিব্য স্পর্শে সাধনার শরীরে অপূর্ব শক্তির সঞ্চার হলো। সে অনুভব করল পূর্ণ শান্তি ও স্বস্তি। শিশুকে কোলে করে দেবতাও গাড়ীতে উঠে বসলেন। গাড়ী অনুপমের গৃহাভিমুখে অগ্রসর হলো। সত্যব্রতের আর গৃহে ফেরা হলো না। সে যখন হাতেনাতে ধরা পড়ে গেল, তখন অনুপম এর প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়বে না, এটাই সে ধারণা করে নিল। সেই ভয়ে সত্যব্রত অনাহারেই সারাটা দিন গহনারণ্যে আত্মগোপন করে অতিবাহিত করল।

গাড়ী দেব-মহিমায় অরণ্য ও প্রান্তর পথ অতিক্রম করে অনতিবিলম্বে পল্লী প্রান্তে এসে পৌছল। এতখানি দূরবর্তী পথ আসতে গাড়ীর কত সময়ের প্রয়োজন এবং কতটুক সময়ের মধ্যে যে গ্রাম প্রান্তে এসে পৌছল, সেদিকে সাধনার বিন্দুমাত্র লক্ষ্য নেই। তার নারী-জীবনে সদ্য সংঘটিত দুঃখময় ও বিচিত্র ঘটনা প্রবাহের দারুণ উত্তেজনায় তার অন্তর তখন আলোড়িত হচ্ছে।

পথি-পার্শ্বস্থ এক পান্থশালার সম্মুখে এসে গাড়ী থামল । দেবতা শিশুকে কোলে করে গাড়ী থেকে নেমে পান্থশালায় প্রবেশ করলেন। সাধনাও এলো। দেবতা তাকে বললেন– "তুমি বড়ো ক্লান্ত হয়েছো; একদিকে নয়-শারীরিক-মানসিক উভয়দিকে। এ-ই তো আমরা গ্রাম-সীমায় এসে পৌঁছেছি, আর একটু পরেই বাড়ী পৌঁছা যাবে। তুমি খোকাকে নিয়ে একটু বিশ্রাম করো; আমি এই আস্‌ছি।" বলে দেবতা কোথায় চলে গেলেন ।

দেবলীলা সহজে বোঝা যায় না। দেবতা চলে যাবার অল্পকালের মধ্যেই সাধনার প্রকৃত স্বামী অনুপম পান্থশালার নিকট দিয়ে কোনো কাজে যাচ্ছিল। সে দেখল-পান্থশালায় শিশুক্রোড়ে স্ত্রী-সাধনা বসে আছে। তার বসন রক্ত-রঞ্জিত। দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল অনুপম। কোনো এক নিদারুণ বিপদাশঙ্কায় তার হৃদয় কেঁপে উঠল। রুদ্ধ উচ্ছ্বাসের এক প্রবল বাধায় সহসা কিছু বলবার চেষ্টা করেও বলতে পারল না। ক্ষণকাল নীরব থেকে সে বল্‌ল– "তুমি এবেশে এখানে কেন? খোকা এলো কখন? পান্থশালার আশ্রয়ে কেন?"

স্বামীর এমনধারা কৌতুক প্রশ্ন সাধনার একটুও ভালো লাগল না। শরীর ও মনের কেমন একটা বিশ্রী অবসাদে সত্যই তার মধ্যে গ্লানিভাব এসেছে। সে বিরক্ত হয়ে বল্‌ল– "কি বলছো কিছুই বুঝতে পারছি না। কৌতুকের একটা স্থান কাল আছে। এসব এখন ভাল লাগে না। সে পরে হবে, আগে আমাদের ঘরে নিয়ে চল। এখন ঘরে পৌঁছতে পারলেই আমি বাঁচি।"

কৌতুক! এতে কৌতুকের কি আছে? তোমায় এবেশে, এ রক্তরঞ্জিত বস্ত্রে পান্থশালায় দেখে সত্যি আমি বিস্মিত হয়েছি। তোমার দাদা ও বৌদি তোমায় তাড়িয়ে দেয়নি তো?"

কথা আর অধিক বাড়তে না দিয়ে সাধনা বল্‌ল– "খোকাকে তোমার কোলে করে, এই যে এক সঙ্গেই গাড়ী করে এলাম, আবার তোমার এতো প্রশ্ন কেন?"

অনুপম সবিস্ময়ে বল্‌ল– "আমি খোকাকে কোলে করে একসঙ্গে গাড়ী করে এলাম, এ তো বড়ো আশ্চর্য কথা। তুমি তো আমায় বড়ো অবাক করলে! এ-কি বলছো তুমি? সে–কোন্ চার মাস পর এইমাত্র

যে তোমার সঙ্গে আমার দেখা! তোমায় যে এখানে এমন সময়, এ অবস্থায় এবেশে দেখবো, তা তো আমার চিন্তার অতীত ছিল। ব্যাপার কি, সব খুলে বলো দেখি!"

সাধনা সবিস্ময়ে বল্‌ল– "কি? তবে তুমি নও? যে আমার খোকাকে কোলে করে আমাকেও একসঙ্গে গাড়ী করে নিয়ে এলো–সে তুমি নও! মরণের পথ থেকে যে আমায় জীবনের পথে টেনে আন্‌ল, মৃত্যুর হাত থেকে যে আমায় রক্ষা করল, অভাগিনীর বিপদাপন্ন জীবনে যে অভয়-মন্ত্র প্রধান করল– সে তুমি নও? তবে কে সে? কোন্ সে আমার জীবনের বন্ধু, কোন্ সে আমার জীবনদাতা? সে কি মানব না দেবতা! কিন্তু, সে যে তোমার মতো, তোমার আকৃতি, তোমার স্বর, তোমার চোখ, তোমার মুখ, তোমার বসন, তোমারই সব কিছু? না– তবে সে মানব নয়? মানবে-মানবে এতো মিল, এত সামঞ্জস্য সম্ভবই না।" এসব বলতে বলতে সে ভক্তি-বিস্ময়ে অবিভূত হয়ে পড়ল, অনুপমও।

সাধনা তার দুঃখ ভারাক্রান্ত কাহিনীর আদ্যন্ত স্বামীর নিকট প্রকাশ করল। তা শুনে অনুপমের চোখ সজল হয়ে উঠল, যুগপৎ হর্ষ-বিষাদ ও বিস্ময়ে পূর্ণ হলো তার অন্তর। খোকাকে বুকে জড়িয়ে ধরে সাধনাকে বলল– "যাক্, যা হবার হয়ে গেছে; আমার খোকন-মণির পুণ্যে সকল দিক রক্ষা পেয়েছে। চলো এখন ঘরে যাই।" এ বলে খোকাকে নিয়ে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই গৃহে প্রত্যাবর্তন করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

(১০)

সন্ধ্যা গত হলো। সত্যব্রত এখনো বাড়ী ফেরেনি। তার স্ত্রীর উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পেল। কি করল, কি হল, চিন্তায় অস্থির গভীর রাত্রে সে চুপি চুপি বাড়ী ফিরে দেখল– তার রাক্ষসী স্ত্রী গৃহদ্বারে বসে বাইরের দিকে শ্যেনদৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকিয়ে আছে। স্বামীকে এতরাত্রে বাড়ী ফিরতে দেখে সমুৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করল– "কেমন সাধনা সিদ্ধ তো?"

সত্যব্রত অনুচ্চ কণ্ঠে বল্‌ল– "হ্যাঁ, সাধনা সিদ্ধ বটে, কিন্তু সত্যব্রত অসিদ্ধ।" বলে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাল। মুহূর্তেই হাস্যময়ী স্ত্রীর মুখ বিমর্ষ হয়ে উঠল দেখে সত্যব্রত বল্‌ল–"দুঃখিত হয়ে মুখভার করো না,

বরং সুখী হয়ে ভগবানকে ধন্যবাদ দাও যে– তোমার স্বামী দেহে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছে।"

স্বামীর এ উক্তিতে স্ত্রী ক্ষুব্ধ অন্তরে বলল– "হয়েছে কি? পুরুষ মানুষ হয়ে সামান্য একটা কাজে গোটা দিন কাটিয়ে দিয়ে– এলে আধো রাত করে।"

"তোমার জন্য একাজ সামান্য হতে পারে, আমার নিকট কিন্তু অসামান্যের চেয়েও বড়।" বলে সে সমস্ত বিবরণ স্ত্রীকে খুলে বলল। শুনে স্ত্রী যারপর নেই দুঃখিত হলো– স্বামীর বিপদের জন্য নয়, সে যে এমন সুন্দর অলঙ্কার লাভে বঞ্চিত হলো– সেই জন্য।

অপরদিকে অনুপম সত্যব্রতের এ ব্যবহারে যৎপরোনাস্তি ব্যথিক হলো। সে ইচ্ছা করল– রাজদরবারে এর সুবিচার না চেয়ে ছাড়বে না। কিন্তু ভ্রাতার প্রতি মমতা পরায়ণ সাধারণ অনুনয় ও বাধার এ ব্যাপারে আর কিছু করা হলো না। বোনের অন্তর স্বর্গীয় স্নিগ্ধ-প্রেমের উৎস, আর ভ্রাতার অন্তর নারকীয় নিষ্ঠুরতায় পরিপূর্ণ।

কিছুদিন গত হলে অনুপম ও সাধনা উভয়ে পরামর্শ করে ভগবান বুদ্ধকে তাদের গৃহে নিমন্ত্রণ করল। যথাসময় তিনি উপস্থিত হলে সুস্বাদু খাদ্য-ভোজ্য পরিবেশনে তাঁকে তৃপ্ত করলেন। আহার কৃত্যের অবসানে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে খোকাকে নিয়ে ভগবানকে বন্দনা করল। খোকার মাতা খোকার দ্বারাও কৃতাঞ্জলিপুটে সুগতের পাদপদ্মে বন্দনা করাল।

তারপর সাধনা ভগবৎ সমীপে বিবৃত করল সমস্ত ঘটনা। পরিশেষে নিবেদন করল– "ভগবান, আপনার প্রদত্ত ত্রিশরণ ও পঞ্চশীল ধর্ম সম্যক গ্রহণ ও প্রতিপালনজনিত মহাপুণ্য-প্রভাবে আমার ও আমার খোকার জীবন রক্ষা পেয়েছে। পরম শান্তির আকর বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ গুণের মহাপ্রভাবে আমরা রক্ষা পেয়েছি, তাই আপনারই সম্মুখে আমার খোকার নামকরণ করা হলো– 'শরণ কুমার।'

ভগবান বুদ্ধ তাঁদের অন্তরে চিত্তানুরূপ ধর্ম-দেশনা করলেন। নৈর্বাণিক সত্যধর্ম তাঁদের অন্তরে এমন এক অপূর্ব আলোকসম্পাত

করল যে এতেই তাঁরা ত্রিবিধ সংযোজন হতে মুক্ত হলেন। অনুপম ও সাধনা হলেন স্রোতাপন্ন।

শরণ কুমারের বয়ঃক্রম যখন বিশ বৎসর, তখন সংসার ধর্মের প্রতি তাঁর বিরাগ উপস্থিত হলো। অচিরে তিনি গৃহত্যাগ করে জিনশাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন। বিদর্শন সাধনায় তিনি মনঃসংযোগ করে অর্হত্ত্ব ফল প্রত্যক্ষ করলেন। কালে তিনি অর্হৎ শরণ স্থবির নামেই হলেন প্রসিদ্ধ।

(রসবাহিনী-শরণ স্থবির)

২। সুপ্রিয়া

(১)

'সুপ্রিয়া' মা-বাপেরই দেয়া নাম।

অনিন্দ্য-সুন্দরী ছোট একটি বালিকা। চাঁপা ফুলের মতো গায়ের রং। শিশির সিক্ত কুন্দ কলিটির মতো সাদা ধব্‌ধবে লাবণি মাখা সুন্দর মুখখানি। বালিকাকে দেখে মনের আশ মেটে না।

সুপ্রিয়া মাতা-পিতার খুবই আদরিণী দুহিতা। তার পিতা বারাণসীর একজন ধনাঢ্য ও স্বনামধন্য ব্যক্তি। কিন্তু ধনের চেয়েও অধিকতর তৃপ্তিতে তাঁদের বুক ভরে উঠেছে– অমন কন্যারত্ন লাভ করে। মাতৃত্বের ও পিতৃত্বের গৌরবে জনক-জননী গৌরবান্বিত। মেয়েটি তাঁদের যেন আনন্দ-নির্ঝরিনী।

সুপ্রিয়া বড় পুণ্যবতী। তা বোঝা যায়–প্রভাতকালীন আকাশের মতো তার জীবন-প্রভাতের দিক থেকে বিচার করলে। সে মাতৃগর্ভে আবির্ভাবের পর থেকেই মতি-পিতার সৌভাগ্যোদয় হয়েছিলো। সবচেয়ে সুখের বিষয়– তাঁদের সুস্থতা ও নীরোগতা। মেয়েটির শুভাগমনে মাতা-পিতা উভয়েই নর-নারী নির্বিশেষে সকলের সুহৃদ ও প্রিয় হয়ে ওঠেন, তাই তাঁরা প্রাণাধিকা দুহিতার নাম রাখলেন– 'সুপ্রিয়া'।

মাধুর্যময়ী এ ছোট বালিকাটিকে দেখলে দেবী প্রতিমা বলে ভ্রম হয়। এমন সুগঠিত অঙ্গ-সৌষ্ঠব, এমন স্নিগ্ধোজ্জ্বল শোভন-মোহন নয়ন

যুগল সচরাচর মানবীতে সম্ভবে না। স্নেহ ও কারুণ্যে ভরা হাস্যোদ্দীপ্ত আননে যেন স্বর্গের শান্তি আভাসিত। কোন্ দেববালা যেন দেবপুরের পথ ভুলে মর্ত্যপুরে নেমে এসেছে।

এ মেয়েটির প্রতি মাতা-পিতার স্নেহ-যত্নের অন্ত নেই। এমন সুখের মধ্য দিয়ে সে এখন অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করেছে। তার অন্তর যেমন কোমল, স্বভাবও তেমন মধুর। আর্তের আর্তনাদে তার হৃদয় হয় দ্রবীভূত, কারুণ্য হস্তে মুছিয়ে দেয় ব্যথিতের ব্যথার অশ্রু, রুগ্নের সেবায় ঢেলে দেয় মন-প্রাণ। 'পর দুঃখ কাতরতা' এ বৈশিষ্ট্যই তাকে কালে মহীয়সী করে তুলেছিল।

(২)

বারাণসী নগরীতে মহোৎসবের সাড়া পড়েছে। ভগবান গৌতম বুদ্ধ ধর্মামৃত পরিবেশন মানসে এ পুণ্যভূমিতে পদার্পণ করবেন। ধ্বজা-পতাকা ও পত্রপুষ্পে সমগ্র নগরী মনোরম শোভা ধারণ করেছে। তথাগতের জয়-স্তোত্রে আকাশ-বাতাস মুখরিত।

এ উৎসবের আয়োজন দেখে সুপ্রিয়ার বালিকা হৃদয় আনন্দে নেচে উঠল। বুদ্ধদর্শনের উদগ্র-বাসনা তাকে আকুল করে তুলল। তার বুদ্ধভক্ত পিতা ও ভক্তিমতী মাতার মুখে সে বহুবারই শুনেছে– সম্বুদ্ধের অতুলনীয় মহিমার কথা। শুনতে শুনতে কখনও বা তন্ময় হয়ে গেছে, কখনও বা বুদ্ধের অসীম মহিমার মধ্যে আপনাকে হারিয়ে ফেলেছে, আর কখনো বা আপনা থেকেই বুদ্ধের উদ্দেশ্যে ভক্তি-নতি নিবেদন করেছে। কিন্তু, স্বচক্ষে তাঁকে নয়ন ভরে দেখা এ পর্যন্ত তার ভাগ্যে ঘটেনি। আজ পূর্ণতা লাভ করবে তার আশা, তাদেরি গ্রামে আজ স্বাগত হবেন লোকনাথ বুদ্ধ। আজই তাঁর দর্শন মিলবে, অদর্শন-পূর্ব চির আরাধ্যের, দেখা পাবে সে চিরবাঞ্ছিত রত্নের, তাই উৎসাহের অন্ত নেই সুপ্রিয়ার, আনন্দের সীমা নেই।

ভগবান অমিতাভ সশিষ্য আনন্দমুখর বারাণসীতে সমাগত হলেন। আজ পুণ্যক্ষণে সুপ্রিয়ার মানস-প্রভুর মঙ্গল বোধন হলো, তার প্রসন্নভাগ্যে সম্যক সম্বুদ্ধের দর্শন লাভ ঘটলো। সে পুণ্যপুরুষকে প্রাণ খুলে দেখলো যুগপৎ হর্ষ ও বিস্ময়ে। এ দেখার আগ্রহ আছে– শেষ নেই, আকাঙ্খা আছে– বিরাগ নেই।

"এমনটি তো আর চোখে পড়েনি! এমন অপূর্ব মধুর রূপশ্রী, এমন পুণ্য লক্ষণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, এমন সুন্দর সুনীল অক্ষিযুগল, এমন ইন্দ্রধনু ভ্রুযুগল, সুগঠিত এমন নাসিকা, এমন মুক্তা-শুভ্র দন্তরাজি, এমন ষড়রশ্মি-দীপ্ত ব্রহ্মচারী, এমন সোনার কান্তি পুরুষ, এমন প্রশান্ত সৌম্য-মূর্তি, এমন মধুর স্বর-লহরী, জীবনে আর তো কখনো দেখিনি, কখনো শুনিনি!" সে নির্বাক–বিস্ময়ে দেখছে, আর এসব চিন্তা করছে। পুণ্যপুরুষ তথাগতের এ অসাধারণত্ব তার অন্তরে জাগিয়ে তুলল পুলক-শিহরণ।

সর্বজ্ঞ বুদ্ধ বুঝলেন বালিকা সুপ্রিয়ার মনের কথা। তিনি ধর্মদেশনা করলেন– এ ছোট বালিকার মনের মতো করে, তার মনের ক্ষুধার যথোচিত অমৃত পরিবেশন করলেন নিয়ামক শাস্তা। মুনীন্দ্রের করুণা, মুক্তিমন্ত্রের পীযুষধারা বালিকার মর্মস্থল স্পর্শ করল গভীরভাবে। সার্থক হলো সম্বুদ্ধের দেশনা। বালিকা উপভোগ করল অমৃতের আস্বাদ। তৃপ্ত হলো তার তৃষিত অন্তর, অনুভব করল অনির্বচনীয় শান্তি। কি এক অব্যক্ত আনন্দের অভিব্যক্তি তাকে স্রোতের মুখে ভাসিয়ে নিয়ে চলল : সম্প্রাপ্ত হলো নির্বাণের প্রথম স্তর। কি সৌভাগ্য সুপ্রিয়ার, সাক্ষাৎ করলেন তিনি স্রোতাপ্রত্তি ফল।

সুপ্রিয়া অষ্টম বর্ষের বালিকা হলে কি হবে, তাঁর অন্তরে নিহিত রয়েছে বহু জন্মের পুঞ্জীভূত পুণ্য-সংস্কাররূপ মহাশক্তি। যার ফলে আজ তিনি এ বালিকা বয়সে উপলব্ধি করলেন চতুরার্য সত্য-নৈর্বাণিক ধর্মের নিগূঢ়তত্ত্ব।

আজ অফুরন্ত আনন্দ, অনবদ্য প্রীতি কে- যে তাঁর কোমল প্রাণে জাগিয়ে দিচ্ছে, তা তিনি নিজেও ভেবে পাননা। তিনি যে বড়ো ভাগ্যবতী, পুণ্যবতী, পুণ্যক্ষণেই ভগবান বুদ্ধের দর্শন পেয়েছেন, একথা স্মরণ হতেই আনন্দাতিশয্যে সম্বুদ্ধের চরণপ্রান্তে লুটিয়ে পড়ে বললেন– 'ভগবান্, আপনি অনন্ত গুণের আধার, আপনি স্নিগ্ধ-শান্তির নির্ঝর।"

কর্মের আশ্চর্য বিধান। শোভন কর্মের বিপাক ও শোভন, সুখময় ও শান্তিময়। তা হয় অচিন্তনীয় ও ঋদ্ধিময়। আট বৎসরের বালিকা আজ স্রোতাপন্না। গোলাপের মধুরগন্ধ মুকুলের মধ্যে সম্পূর্ণ বিকাশলাভ না

করলেও নিহিত থাকে। সুপ্রিয়া আজ যে-স্রোতে পড়েছেন, এ স্রোতস্বিনীর স্রোতে ভাটা পড়ে না; এ স্রোত উজান গাঙের মতোই তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

অনাবিল প্রত্যক্ষজ্ঞানে তিনি বুঝতে পারলেন– জগতে শান্তিপ্রদ মুক্তিপ্রদ বলে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করবার যদি কেউ থাকেন, তবে তিনি সর্বজ্ঞ বুদ্ধ, তাঁরই প্রচারিত সত্যধর্ম এবং নীতি অনুযায়ী ভিক্ষু সংঘ। তাই তাঁর পবিত্র-কোমল অন্তরে তিনি রচনা করে রাখলেন ত্রিরত্নের জন্য সর্বোচ্চ আসন। তাঁর দৃঢ় সংকল্প-জীবন দিয়েও অক্ষুণ্ন রাখবেন এ পবিত্র আসনের মর্যাদা। এ সম্যক্ সংকল্পের সার্থকতা সম্পাদনে দান-শীলকে গ্রহণ করলেন জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রতরূপে। বুদ্ধ ও ভিক্ষু সংঘের সেবায় উৎসর্গ করবেন তাঁর জীবন। এতেই তাঁর সুখ, এতেই তাঁর শান্তি।

(৩)

আট বৎসর পরের কথা। কুমারী সুপ্রিয়া তাঁর যৌবনের অনুপম মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ হয়ে ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করেছেন। তাঁর স্নিগ্ধোজ্জ্বল মুখখানি লাবণ্যে ভরে উঠেছে, কারুণ্যেও হয়েছে ভরপুর। এ পুণ্যময়ী নারীর রূপ-গুণের কথা সমগ্র বারাণসীতে প্রকাশ হয়ে পড়ল। নানা স্থানের ধনাঢ্য পরিবার থেকে তাঁর বিবাহ-সম্বন্ধ আসতে লাগল। কিন্তু, মাতা-পিতার ইচ্ছা–তাঁদের প্রাণসমা কন্যাকে এক সুপাত্রের হস্তেই সমর্পণ করবেন।

পাত্র সুপ্রিয়–শ্রাবস্তীর এক বিত্তশালী পরিবারের সন্তান। সুপ্রিয় সুদর্শন যুবক, বলিষ্ঠ গঠন, শিক্ষিত ও অমায়িক। এমন সর্বগুণসম্পন্ন যুবক সচরাচর দেখা যায় না। পাত্রের আর একটা বিশেষ গুণ হলো-ত্রিরত্নে অবিচল নিষ্ঠা ও ধর্মপ্রাণতা।

যথাসময়ে শুভ পরিণয় সম্পন্ন হয়ে গেল। বরকন্যার গুরুজনবর্গ এ মিলনে আনন্দিত হলেন এবং নবদম্পতির কল্যাণ কামনা করলেন। সুপ্রিয়ার সঙ্গে সুপ্রিয়ের হলো মধুর মিলন, উভয়েই অনুভব করলেন অসীম তৃপ্তি। উপযুক্ত স্বামী লাভ করে সুপ্রিয়া মনে করলেন– তাঁর নারী-জীবন সার্থকতার গৌরব-মর্যাদায় ভরে উঠেছে। আর সুপ্রিয় তিনি পেয়েছেন–তাঁর মানসী-প্রিয়াকে। সর্বগুণমন্ডিতা অনিন্দ্যসুন্দরী সুপ্রিয়া

তাঁর সহধর্মিনী, জীবন-পথের সঙ্গিনী। তাই আনন্দে হয়েছে তাঁর অন্তর পরিপূর্ণ।

স্রোতাপন্না সুপ্রিয়া সবচেয়ে অধিক শান্তি ও প্রীতি লাভ করলেন স্বামীর ভক্তিশ্রদ্ধা দেখে। এটাই তাঁর পক্ষে পরম লাভ বলে মনে হলো। এর ফলে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই হলেন– সংঘের দায়ক-দায়িকা, সেবক-সেবিকা। তাঁদের গার্হস্থ্য জীবনের ব্রত স্বরূপ নিত্য-নৈমিত্তিক কাজের মধ্যে গণ্য হলো– প্রতিদিন বিহারে গমন ও ধর্মশ্রবণ, নিয়মিত ভিক্ষুদর্শন ও তাঁদের অভাব পূর্ণকরণ।

একদিন সুপ্রিয়া ভগবান বুদ্ধের নিকট ধর্ম শুনে ভিক্ষুদের দর্শনেচ্ছায় বের হলেন। কক্ষ হতে কক্ষান্তরে ভিক্ষুগণকে ভক্তি-বন্দনা জানিয়ে তাঁদের কুশলাকুশল এবং কিছুর প্রয়োজন আছে কি না জিজ্ঞাসা করে করে চলছেন। এক প্রকোষ্ঠে তিনি দেখলেন– এক রুগ্ন ভিক্ষু শয্যাগত হয়ে আছেন। রোগ যন্ত্রণায় তিনি কাতারাচ্ছেন। তাঁর বিশুষ্ক পাংশু-বদন দেখে দুঃখে ভারাক্রান্ত হলো সুপ্রিয়ার অন্তর। এ অসহায় রুগ্ন-ভিক্ষুকে তিনি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন রোগের কথা। রোগী রোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলেন। শুনে, সুপ্রিয়ার কোমল প্রাণে বড়ো ব্যথা ও করুণার সঞ্চার হলো। "ভন্তে, আপনার এ অবস্থায় কিছুর প্রয়োজন বা খেতে ইচ্ছা হলে দয়া করে আমায় বলুন। আমি স্বেচ্ছায় আপনাকে এ প্রার্থনা জানাচ্ছি, নিঃসংকোচে আমায় বলুন। তা আপনার চাওয়া নয় আমায় সেবা-ধর্মের সুযোগ দেওয়া মাত্র। বলুন ভন্তে, কিসের প্রয়োজন আপনার?" জিজ্ঞাসা করলেন সুপ্রিয়া।

রুগ্নভিক্ষু বললেন, ক্ষীণস্বরে– "জানি উপাসিকে, তোমার ত্যাগ ও সেবার কথা। এটাও জানি– তথাগতের সত্য ও অহিংসার বাণী তোমার মনোমন্দিরে আলোকসম্পাত করেছে। জানি না রোগীর মনে কেন জাগে নানা কিছু খাবার সাধ। আমার খুব ইচ্ছা হয়েছে– একবার মনের মতো করে মাংসের জুস পান করি। যদি সম্ভব হয়, তা'ই দিও।"

সুপ্রিয়া সানন্দে বললেন– "নিশ্চয়ই দেবো ভন্তে আগামীকাল পূর্বাহ্নে তা আমি পাঠিয়ে দেবো।" এ বলে উপাসিকা বাড়ী ফিরলেন।

(৪)

অচিরাবতীর পরপারে ঘন মসীরেখা– টানা গ্রামখানির অন্তরালে সূর্য ডুবে গেল। সন্ধ্যা এল ধীরে মন্থরে শোকাতুরা নারীর মতো পৃথিবীর উপর দিয়ে নীরব চরণ ফেলে। দেখতে দেখতে তার কালো উত্তরীয়ের আবরণে পৃথিবীর হাসিভরা সুন্দর-দীপ্ত মুখখানা ঢেকে গেল। আঁধারের কৃষ্ণ যবনিকায় ধরণীর রঙ্গমঞ্চের আলো-হাসি শ্যামলরূপে অবলুপ্ত হয়ে গেল।

পুণ্যভূমি শ্রাবস্তীর ঘরে ঘরে সাঁঝের প্রদীপ জ্বলে উঠেছে। বিহারে বিহারে সান্ধ্যোপসনার মিলিত কণ্ঠের বন্দনা-ধ্বনি সন্ধ্যার প্রশান্তিকে কাঁপিয়ে তুলল। ব্যগ্র ও উদ্বেগ-উদ্বেলিতা সুপ্রিয়াকে কিন্তু, এসবের কিছুই মুগ্ধ করতে পারল না। ঘুরে-ফিরে তাঁর মানসপটে ভেসে ওঠে- অসহায় সে রুগ্ন ভিক্ষুর পাণ্ডুর-মুখ, কোটরাগত চক্ষু। একথা মনে পড়তেই করুণাময়ীর করুণ-হৃদয় হাহাকার করে ওঠে।

এ নিয়ে কত কি তাঁর মনে উদয় হয়, কত কিছু তিনি ভাবতে থাকেন। তিনি ভাবেন– "এ রুগ্ন ভিক্ষু ঈপ্সিত বস্তু তিনি যদি এখনি সম্মুখে ধরে দিতে পারতেন, এখন সায়াহ্নে না হয়ে যদি সকাল হতো!" ইত্যাদি কত চিন্তা তাঁর। এ সন্ধ্যা ও সকালের মধ্যে একটা মাত্র রাত্রি, তাঁর কাছে যেন একটি বৎসরের ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। যতক্ষণ না তিনি কথা-দেওয়া রোগীর পথ্য যোগাড় করে দিতে পারেন, ততক্ষণ তাঁর উদ্বিগ্ন প্রাণে স্বস্তির আশা নেই।

"ভগবান বুদ্ধের মুখে শুনেছি– 'যে রোগীর সেবা করে, সে তথাগতকে সেবা করার মতো পুণ্যার্জন করে। রোগীকে দান করলে, সে দান হয় সময়োপযোগী দান, উপযুক্ত ক্ষেত্রে দান সৎপুরুষের দান অর্থাৎ সৎপুরুষেরাই এরূপ দান করে থাকেন।' আমার পরম সৌভাগ্য যে– দান ও সেবা দুই পুণ্যকর্মেরই সুযোগ যেন অব্যাহত থাকে।" চিন্তা করলেন সুপ্রিয়া।

সে রাত্রে তিনি স্বামীকে একথা শোনালেন। শুনে, সুপ্রিয় খুবই সন্তোষ প্রকাশ করলেন এবং এরূপ সাধু সংকল্পের জন্য পত্নীকে প্রশংসা করে বললেন– "ভালই করেছো প্রিয়া! রোগীর উপযুক্ত পথ্য দিয়ে সেবা করা বড়ই পুণ্যের কথা। এ পুণ্যের ফল তোমাকে

ভবিষ্যতে রোগ-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেবে। রোগহীন দেহ যে সুন্দর ও বলিষ্ঠ হয়। 'আরোগ্যা পরমা লাভা' নীরোগতা পরম লাভ, এটা মহাকারুণিক বুদ্ধের উদাত্ত বাণী।"

ধর্মপ্রাণ স্বামীর উৎসাহ বাণী সুপ্রিয়ার প্রাণে প্রবল উদ্দীপনার সঞ্চার করল। স্বামীর প্রতিটি কথা তাঁর অন্তরে সেবা-ধর্মের পীযুষধারা বর্ষণ করল। আনন্দাতিশয্যে বলে উঠলেন সুপ্রিয়া– "আমি এদিক দিয়ে নিজকে সৌভাগ্যবতী মনে করি যে, তোমার মতো সহধর্মী স্বামী লাভ করতে পেরেছি। স্বামী যদি সহধর্মী হয়, আর স্ত্রী যদি হয় সহধর্মিনী, সেখানেই হয় স্বর্গসুখ। যে মিলনে তা হয়ে উঠে না– সে মিলন, সে দাম্পত্য-জীবন মধুময় না হয়ে, হয় বিষময়।"

স্বামী সুপ্রিয় উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন– "ঠিকই বলেছো সুপ্রিয়া। আমাদের মিলন, আমাদের দাম্পত্য-জীবন নিশ্চয়ই মধুময়। নিজেকে পরম ভাগ্যবান বলে মনে করছি, তোমায় পত্নীরূপে লাভ করতে পেরে। খাদ্য-ভোজ্য দানে জননীর মতো বাৎসল্যময়ী, আদর-যত্নে বোনের ন্যায় প্রীতিময়ী, সেবা কর্মে দাসীরূপিনী, শান্তি দায়িনী, ভালোবাসায়-সখীর মতো আনন্দদায়িনী, পুণ্যকর্মে উৎসাহদায়িনী ও সহধর্মীনি– যে পত্নীর মধ্যে একাধারে এতগুণ বিদ্যমান, আচ্ছা তুমি বলো তো প্রিয়া, তেমন পত্নীর স্বামী হওয়া কি গৌরবের বিষয় নয়?"

কথা সত্য হলেও, শুনে সুপ্রিয়া লজ্জিতা হলেন। লজ্জা-জড়িত স্বরে তিনি বললেন– "খুবই তো প্রশংসা করলে দেখছি। আমি যা করি, একান্ত করণীয় মনে করেই করি, আমার নারীধর্ম বোধেই করি। তাই বলে এতো প্রশংসা কেন? তুমি আমায় সত্যি স্নেহ কর, আদর কর- তাই বলে প্রশংসাচ্ছলে আমায় লজ্জা দেওয়ায় তোমার সার্থকতা কি? অনেক রাত্রি হয়েছে, এখন নিদ্রার সময়।" এ বলে সুপ্রিয়া উঠে চলে গেলেন।

(৫)

সুপ্রিয়ার যখন নিদ্রা ভাঙ্গল, তখন প্রভাত হয়েছে। বিহঙ্গকূলের কলকুজনে প্রাভাতিক প্রশান্তি কেঁপে উঠেছে। বালার্ক কিরণের নয়ন-মোহন সোনালী আভা পূর্বদিককে রাঙিয়ে তুলেছে। চারদিক আমোদিত করে তুলেছে অজস্র ফুটন্ত ফুলের গন্ধ। পৃথিবীর বুকে আবার নতুন

প্রাণ, নতুন উচ্ছ্বাসের ঢেউ বয়ে চলেছে। কিন্তু এ পৃথিবীরই জীব সুপ্রিয়ার এ প্রভাতী আনন্দকে ছাপিয়ে তুলেছে-নিরবলম্ব সেই রোগক্লিষ্ট ভিক্ষুর পান্ডুর মুখ। 'আজ যে সে রুগ্ন ভিক্ষুর মুখে তাঁর পথ্য দিতে হবে।' একথা মনে পড়তেই ধড়মড় করে তিনি শয্যা ছেড়ে উঠে পড়লেন। তাড়াতাড়ি প্রকোষ্ঠ থেকে বেরিয়ে এসে দাসীকে ডাক দিলেন– "দাসী!"

"এই যে মা, আসছি।" বলে দাসী এলে তার হাতে মুদ্রা দিয়ে সুপ্রিয়া বললেন– "যা, আজ একটু সকাল সকাল বাজারে যা, আর এ মুদ্রা দিয়ে ভাল মাংস কিনে নিয়ে আয়। দেখিস্, দেরী করিস না যেন।"

আজ গৃহকর্ত্রীর এমন তাড়াহুড়ো দেখে দাসী আর কালবিলম্ব না করে বাজারে চলে গেল। অনেকক্ষণ হলো, দাসী বাজার থেকে এখনও ফিরে এলো না। "ব্যাপার কি? এখনও যে দাসী এলো না, এর কারণ কি?" অতি উৎকণ্ঠিত চিত্তে চিন্তা করলেন সুপ্রিয়া।

বেলা যতই বাড়তে লাগল, তিনি ততই চিন্তাযুক্ত হলেন। রুগ্নভিক্ষুর বিষাদমলিন ছবি স্মৃতিপথে ভেসে উঠল, তাঁর বুকের ভিতরটা শিউরে ওঠে। সংক্ষুব্ধ মন কি যেন একটা অনিশ্চিত আতংকের বিভীষিকায় চমকে ওঠে।

দাসী অনেক দেরীতে ফিরে এলো। ওর সাড়া পেয়ে সুপ্রিয়া দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে এসে উৎফুল্ল হয়ে বললেন– "এসেছিস্, এতো দেরী হলো যে?" দাসীর হাতে মাংস না দেখে হঠাৎ চমকে উঠে বিমর্ষ মুখে জিজ্ঞাসা করলেন– "কি রে, মাংস কই! খালি হাতে যে ফিরে এলি?"

দাসী কপালের ঘাম মুছে নিরাশ ও ভীতস্বরে বলল– "আজ সারা শ্রাবস্তী শহর ঘুরে-ফিরে কোথাও যে মাংসের খোঁজ পেলাম না মা! মাংসের দোকান আজ সবই বন্ধ। ব্যাপার কি বুঝতে না পেরে একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম– "মশাই, মাংসের দোকান আজ বন্ধ কেন?" লোকটা হঠাৎ অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে বলল– "আজ যে উপোসথের দিন, তা কি তুমি জান না? কেন, উপোসথ দিনেও বুঝি মাংস খাবার লোভ সাম্‌লাতে পারলে না?" এ বলে লোকটা আমার

দিকে কেমন যেন এক অবজ্ঞার তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চলে গেল। কী যে লজ্জা পেলাম মা, তা আর কি বল্‌বো।"

দাসীর এমন অপ্রত্যাশিত উত্তরে সুপ্রিয়ার মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। "সত্যিই তো, আজ যে উপোসথ! একথা তো আমার মোটেই মনে ছিলো না! আজ যে মাংস পাওয়া যাবে না, তবে উপায়? মাংসের জুস দিয়ে রোগীর মুখে পথ্য দেবো বলে কাল যে কথা দিয়ে এলাম! আহা, রোগক্লিষ্ট দুর্বল ভিক্ষু, তিনি কি পথ্যের আশায় আমার পথপানে চেয়ে থাকবেন না?" একথা মনে পড়তেই সুপ্রিয়া শিউরে উঠলেন। তাঁর বুকটা যেন মুচড়ে চৌচির হয়ে ফেটে যেতে চায়। হতাশা ও আতংকের প্রবলতায় তাঁর দেহখানা আচম্বিতে কেঁপে উঠল। তাঁর পায়ে নীচে। পৃথিবী যেন সরে যেতে লাগল, চোখ অন্ধকার হয়ে এল, অমনি তিনি অস্ফুট কাতর-ধ্বনি করে ভূ-পৃষ্ঠে বসে পড়লেন।

কর্ত্রী ঠাকুরাণীর এ অবস্থা দেখে দাসী বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলো। সে আজ অনেক দিন ধরেই এ বাড়ীতে কাজ করে যাচ্ছে, কিন্তু মমতা ও সেবাপরায়ণা গৃহকর্ত্রীর এমন ভাব তো কোনো দিন দেখে নি। সে তাড়াতাড়ি ভীত-কম্পিত হস্তে সন্তর্পণে সুপ্রিয়াকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বলল– "সামান্য মাংসের অভাবে আপনি আজ এতো অস্থির হচ্ছেন কেন মা! উপোসথ দিনে তো আপনাদের মাংস খেতে দেখি নি? মাংসের জন্য আজ আপনার এতো ব্যাকুলতা কেন মা?"

দুঃখের প্রবল উচ্ছ্বাস সুপ্রিয়ার সমস্ত অন্তরকে মথিত করে দীর্ঘশ্বাসরূপে বের হয়ে গেল। হতাশাচ্ছন্ন কাতর কণ্ঠে তিনি বললেন– "তুই আমার মর্মদাহের কথা কি বুঝবি দাসী? মাংস খেতে যে আমার সাধ হয়েছে তা নয়, তা যে রোগাতুর ভিক্ষুর পথ্যের জন্য। তাঁকে মাংসের জুস দেবো বলে কাল কথা দিয়ে এসেছি। তিনি কি জুস পাবার আশায় এখন সতৃষ্ণ-নয়নে আমার প্রতীক্ষায় চেয়ে থাকছেন না? মাংস পাবার ভুল ধারণায় আমি এ কি করলাম দাসী? এ জুস পথ্যের উপর যে তাঁর মরা-বাঁচা নির্ভর করে না, একথা কেমন করে বলি? এ পথ্য সেবনে হয়তঃ তিনি সুস্থ হয়ে নবজীবন লাভ করতে পারেন, অথবা এর অভাবে রোগক্লিষ্ট ক্ষীণ জীবন-শিখাও চিরতরে নিভে যেতে পারে। তা যদি হয় ঝি, এর চেয়ে দুঃখ-সন্তাপের বিষয় আর কি হতে

পারে?" একথা বলতে বলতে সুপ্রিয়ার চোখের দুকূল ছাপিয়ে অশ্রু বন্যা নেমে এলো, নিশীথ রাতের দুঃখের বাদল-ধারার মতো।

সবিস্ময়ে দাসী বলল– "মা, আজ যখন মাংস পাবার আর কোনো উপায় নেই, না হয় আজ আর রোগীর পথ্য নাইবা দিলেন, আগামীকাল দিলেই তো চলবে। বলেন তো আমি গিয়ে ভিক্ষুকে তা বলে আসি।"

সুপ্রিয়ার চিন্তাচ্ছন্ন অপলক নেত্রে বাইরের দিকে তাকিয়েছিলেন। দাসীর পানে মুখ না ফিরিয়ে সে অবস্থাতেই বললেন,

"অসম্ভব, এ যে হতে পারে না।"

"কেন মা, হতে পারে না কেন?"

সুপ্রিয়া একটু বিরক্তির স্বরে বললেন- "কেন হতে পারে না, এর কারণ তুই বুঝতে পারবি না দাসী। আমার ব্যথা যে কোন্ খানে, তা তুই কি করে বুঝবি? এতে তোর মাথা ঘামিয়ে ফল নেই। যা, তোর কাজ তুই গিয়ে দেখ্‌গে।"

দাসী চলে গেল। সুপ্রিয়া সেখানেই বসে আনমনে কি চিন্তা করলেন। হঠাৎ তাঁর আননে স্নিগ্ধোজ্জ্বল আভা ফুটে উঠল, মেঘ-মুক্ত চাঁদের মতো। ভাবী সাফল্যের উচ্ছ্বাসময় এক প্রবল আবেগে তাঁর ব্যথিত বুকখানা তৃপ্তিতে যেন ভরে গেল। অমন শোভন-শ্রেষ্ঠ প্রাণঢালা সেবা-ধর্মের সুযোগ থেকে সে বঞ্চিত হতে পারবে না। বাসনা পরিতৃপ্তির দুর্নিবার আকাঙ্খা তাঁর মনকে উদ্বেলিত করে তুললো। সফলতার মৃদুল-পবনে তাঁর মূর্চ্ছাহত আশা-বীথিকার ডাল-পালাগুলি মুকুলিত হয়ে ধীরে ধীরে আন্দোলিত হতে লাগল। অকূল সমুদ্রের কোথায় কূল পেয়ে তাঁর বুকখানা আনন্দে ভরে উঠল। সুপ্রিয়া সেখান থেকে উঠে ধীরে ধীরে তাঁর শয়নকক্ষে প্রবেশ করলেন।

(৬)

তখন কোশলরাজ প্রসেনজিৎ ছিলেন শাবস্তীর ভাগ্য-নিয়ন্তা। ধার্মিক রাজার ধর্মানুশাসনে গৌরবোজ্জ্বল শ্রীসম্পদে শ্রাবস্তী সমুন্নতা। প্রজামন্ডলীর উপর নরপতির এ আদেশ ছিল যে–"প্রতি মাসের দু'অষ্টমী ও অমাবস্যা-পূর্ণিমা উপোসথ দিবসে আমার রাজ্যের কোথাও কেহ প্রাণীহত্যা করতে পারবে না। এ আদেশ লংঘনকারীকে যথাবিধি কঠোর দন্ডে দন্ডিত হতে হবে।"

ক্রমে বেলা যতই বেড়ে উঠল, সুপ্রিয়া ততই এক কঠোর দুঃসাধ্য সাধনের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। তাঁর দেওয়া প্রতিশ্রুতি তাঁকে রক্ষা করতে হবে। এর জন্য উত্তেজনার বশে অথবা জন্মান্তরীণ সংস্কারের প্রবল আকর্ষণে, উপরন্ত হেতু-নিমিত্ত উৎপন্ন হওয়ার দরুণ তাঁর একবারও মনে পড়ল না যে নরমাংস নরের অখাদ্য। বিশেষতঃ আর্যদের পক্ষে এটা বড়ই নিন্দনীয় ও দোষাবহ।

সুপ্রিয়া এবার শয়ন-প্রকোষ্ঠের দ্বার বন্ধ করলেন। ঘর থেকে রৌপ্যময় একখানা থালা, ধারাল চক্‌চকে একখানা ছুরিকা এবং পরিস্কার এক টুকরা কাপড় নিয়ে পালংকের উপর বসলেন। তারপর তাঁর উরুর কাপড় অপসারিত করলেন। সম্মুখস্থ ছুরিকা নিয়ে অম্লান বদনে, অকম্পিত চিত্তে তাঁর যুবতী-দেহের নিটোল স্নিগ্ধসুন্দর মাংসল উরুপ্রদেশে অবলীলাক্রমে দ্রুত ছুরি চালনা করে পরিমাণ মতো মাংস কেটে নিয়ে থালায় রাখলেন। সঙ্গে সঙ্গে রক্তধারা প্রবাহিত হয়ে সে স্থান রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেল। সুপ্রিয়া ক্ষিপ্রহস্তে সম্মুখস্থ ছিন্ন বস্ত্রে কর্তিত স্থান উত্তমরূপে বেঁধে দিলেন এবং ছুরিকা ও রক্তমাখা বস্ত্রাদি একপাশে সরিয়ে রেখে দ্বার খুলে দাসীকে আহ্বান করলেন—দাসী!"

ডাক শুনে শশব্যস্তে দাসী এসে সম্মুখে দাঁড়াতেই সুপ্রিয়া নির্বিকার চিত্তে তাঁর হাতে মাংসের থালা তুলে দিয়ে বললেন—"ভালোরূপে এ মাংসের জুস তৈয়ার কর্‌গে যা। গতকাল আমি যে রুগ্ন ভিক্ষুকে জুস দেবার কথা বলেছিলাম, এ জুস তাঁকেই দিয়ে আস্‌বি। দেরী করিস্ না যেন, বেলা বারটার আগেই তাঁর পথ্য গ্রহণ করা চাই। আমার কথা জিজ্ঞাসা করলে, বলবি— আমার অসুখ করেছে।"

দাসী মাংস দেখে বিস্ময়াবিষ্ট হলো। সন্দিগ্ধচিত্তে সে জিজ্ঞাসা করল—"এ যে টাট্‌কা মাংস মা! কোথা থেকে এলো? এ মাংস কোথা পেলেন মা?"

"তোর এত খোঁজে কাজ নেই দাসী, শীগ্‌গির যা, ভালো করে জুস তৈরী করে নিয়ে যা, দেরী হলে ভিক্ষু পথ্য গ্রহণে বিমুখ হবেন।"

দাসী মাংস হস্তে নির্বাক— বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার বাক্‌শক্তি যেন লোপ পেয়েছে, চলৎশক্তি যেন রহিত হয়ে গেছে। সুপ্রিয়ার মনের গোপন-কথা সে উপলব্ধি করল। কি যেন কি একটা

অনিশ্চিত অথচ সদ্য সংঘটিত আতংকের বিভীষিকায় সে শিউরে উঠল।

দাসী তখনও মাংসহস্তে দাঁড়িয়ে আছে দেখে সুপ্রিয়া বিরক্তির স্বরে বললেন– "কি, এখনো তুই দাঁড়িয়ে আছিস্ ঝি? সময় অতীত হলে, এ জুস যে আর কোনো কাজে আসবে না।"

সুপ্রিয়ার এ কথায় দাসীর যেন সম্বিৎ ফিরে এলো। সে অসহায়ার মতো একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

সদ্য কর্তিত ক্ষতস্থানের যন্ত্রণায় সুপ্রিয়া আর দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে পালংকের উপর শুয়ে পড়লেন। যন্ত্রণা তাঁর সামান্য নয়। কাটার যন্ত্রণা কতো কঠোর, কী অসহ্য ব্যথা! অসীম সহিষ্ণুতার সাথে তিনি তা সহ্য করতে লাগলেন। তিনি ভাবেন কেবল ত্রিরত্নের মহিমার কথা, আর্তের সেবার জন্য দিতে পেরেছেন আপন শরীরের মাংস কেটে, পরের সুখ-পরের শান্তির জন্য নিজের দুঃখ-যন্ত্রণাকে ডেকে এনেছেন ক্ষতি নেই– এতে তাঁর সংকল্প সিদ্ধ হয়েছে, রক্ষা হয়েছে প্রতিশ্রুতি, পূর্ণ হয়েছে সেবা-ধর্ম, জীবনের সাধনা। এতেই তাঁর অপরিসীম তৃপ্তি, অনাবিল শান্তি।

দাসী যত সহসা পারল মাংসের জুস রান্না করে যথাসময়ে বিহারে নিয়ে গিয়ে রুগ্ন ভিক্ষুকে দিয়ে এলো।

(৭)

সুপ্রিয়ার স্বামী যখন ঘরে ফিরলেন, তখন বেলা হবে প্রায় দশটা। তিনি পত্নীর সাথে সাক্ষাতের ইচ্ছায় সোজা রন্ধনশালায় চলে এলেন। সেখানে তাঁকে না দেখে দাসীকে জিজ্ঞাসা করলেন– "কর্ত্রীঠাকুরাণী কোথায়?"

উত্তর হলো– "তিনি শোবার ঘরেই শুয়ে আছেন।"

স্বামী সুপ্রিয়– "অসময়ে শুয়ে আছো কেন প্রিয়া!" বলতে বলতে সুপ্রিয়ার শোবার ঘরে ঢুকে পড়লেন। ঢুকা মাত্রই একপ্রান্তে দেখতে পেলেন–রক্তাক্ত কাপড় ও রক্তমাখা ছুরিকা। সম্মুখে সর্পদষ্ট ব্যক্তির মতো চমকে উঠে দু'পা পিছিয়ে গেলেন এবং সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন– "সুপি! এ কিসের রক্ত?"

স্বামীর ভীতি– বিহ্বল অবস্থা দেখে সুপ্রিয়া আপন যন্ত্রণার কথা ভুলে গেলেন। তাঁর মুখে একটু মৃদুহাসি ফুটে উঠল। বললেন তিনি আশ্বাস বাক্যে–"রক্ত দেখে ভয় পেলে বুঝি? রক্ত-মাংসের মানুষের রক্ত দেখে এতো ভয়! কোনো ভয় নেই, নিকটে এসো, বল্‌ছি।"

সুপ্রিয় যন্ত্র চালিতের মতো নির্বাক–বিস্ময়ে গিয়ে পত্নীর পাশে বসলেন। সুপ্রিয়া বলতে আরম্ভ করলেন– "আজ যে উপোসথ দিবস, একথা আমার মোটেই মনে ছিল না। আমি যে রুগ্ন ভিক্ষুকে মাংসের জুস দেবো বলে কাল কথা দিয়ে এসেছি, আজ উপোসথ হেতু আমার সে কথা নিস্ফলতায় পর্যবসিত হতে বসেছে। আমার জীবন যায় যাক্ তবুও আমার কথার যেন ব্যতিক্রম না ঘটে; নিরবলম্ব অসহায়ের আশার জীবনে তো ছাই দিতে পারি না। অন্য মাংসের অভাবে আমার উরুমাংস কেটে দিয়ে, জুস করিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি।"

পত্নীর এমন দারুন–দুঃসাহসিক কার্যের কথা শুনে সুপ্রিয় শিউরে উঠলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এক অস্ফুট কাতরধ্বনি করে উঠলেন তিনি আর কথা বলতে পারলেন না, কেবল পত্নীর মুখ পানে চেয়ে রইলেন বিস্ময়–দৃষ্টিতে।

সুপ্রিয়া স্বামীর একখানা হাত ধরে বললেন– "খুবই বিস্মিত হয়েছো, কেমন? সর্বত্যাগী বুদ্ধপুত্রের সেবার জন্য নিজের সামান্য দেহমাংস দান করতে পেরেছি বৈ-তো নয়-এতে বেশী আর কি করা হলো। তুমি কি ভুলে গেছো প্রিয়, শিবিরাজ ত্যাগের মহিমা স্মরণ করে চক্ষুদান করেছিলেন? নন্দিক ভ্রাতৃদ্বয় মায়ের জীবন রক্ষার জন্য আত্মদান করেছিলেন? ভুরিদত্ত– শঙ্খপাল শীল রক্ষার জন্য দেহদান করেছিলেন? এরূপ আরো কতো আত্মদানের লোমহর্ষকর কাহিনীর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত বিদ্যমান রয়েছে। এসব গৌরবোজ্জ্বল ত্যাগের সঙ্গে তুলনা করলে, আমার এ দান তো অতি অকিঞ্চিৎকর। করুণাময় বুদ্ধ না বলেছেন– লোকেরা শরীর রক্ষার জন্য ধন-সম্পদ ত্যাগ করে, জীবন রক্ষার জন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ত্যাগ করে, ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি কিন্তু ধর্মরক্ষার জন্য ধন-সম্পদ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, এমন কি জীবন পর্যন্ত ত্যাগ করেন? ধর্মের জন্য জীবন ত্যাগের সুযোগ আমার এ জীবনে ঘটে কি

না জানি না; তবে আজ যা করেছি, তজ্জন্য মনঃক্ষুণ্ন না হয়ে, হর্ষোৎফুল্ল হবারই কথা।"

তাঁরপর কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব। সুপ্রিয় বিস্মিত অন্তরে চিন্তা করতে লাগলেন– "সুপ্রিয়া আমার চেয়ে অনেক উর্ধে; এরূপ ত্যাগ, এমন করুণা, এতো প্রগাঢ় শ্রদ্ধা–দেখলাম জীবনে এই প্রথম।" পত্নীর প্রতি তিনি এতো প্রসন্ন হলেন যে, তা ভাষায় ব্যক্ত করার নয়। ভাবাবেগে তিনি বলে উঠলেন– "প্রিয়া, তুমি মহীয়সী নারী! এতোদিন জানতাম– তুমি শ্রদ্ধাবতী, উদার হৃদয়া, দানশীলা ও সেবাপরায়ণা; কিন্তু এমনতর ত্যাগ ও সেবার কথা তো আমি জানতাম না। তোমার এ পুণ্যাবদান আমায় দিয়েছে আলোকের সন্ধান। মনশ্চক্ষে তোমায় যতই দর্শন করি ততই আমার অন্তরে তুমি প্রতিভাত হও–অসামান্যা মহিমাময়ীরূপে।"

বাস্তবিকই পত্নী সুপ্রিয়া যে এমন শ্রদ্ধাবতী ও ত্যাগশীলা, তা সম্যক্ পরিচয় এতদিন তিনি পান নি; আজ কিন্তু, এমন জ্বলন্ত প্রমাণ পেয়ে তিনি বিস্ময়-সাগরে মগ্ন হলেন। এমন দেবী-দুর্লভ পত্নীর জন্য তাঁর হৃদয়ে রচনা করলেন তিনি অতিসুন্দর, অতি সমুজ্জ্বল মহার্ঘ আসন। "সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে", তাঁর এ সংসার, গৃহীজীবন অনুপম-অনাবিল সুখ, শান্তি ও আনন্দে ভরে উঠল। যেদিকে তাঁর দৃষ্টি পড়ে, সেদিকই যেন মৈত্রী-করুণার জোয়ার প্লাবিত হয়ে যাচ্ছে।

(৮)

সুপ্রিয়ার এ অসাধারণ কার্য সর্বজ্ঞবুদ্ধের অগোচর রইল না। এ নারী-দেহের বেদনায় করুণাঘন বুদ্ধের প্রাণ মহাকরুণার উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। তিনি আর পারলেন না জেতবনে নিবিষ্টমনে বসে থাকতে। ভিক্ষাপাত্র হস্তে বের হয়ে পড়লেন সুপ্রিয়াদের গৃহপানে।

আজ হঠাৎ ভগবানকে গৃহদ্বারে দেখে সুপ্রিয় যে কি করবেন, তা তিনি সহসা ঠিক করে উঠতে পারলেন না। দ্রুত সুপ্রিয়ার নিকট গিয়ে বললেন– "প্রিয়া, ভগবান বুদ্ধ আমাদের গৃহদ্বারে স্বাগত।"

এ কথা শুনে সুপ্রিয়া উৎফুল্ল হয়ে বললেন– "ভগবান শুভাগত হয়েছেন এ আমাদের পরম সৌভাগ্য। তাঁকে অভ্যর্থনা করে বসাবার

আগে কি আমাকে এসে বলতে হয়? যাও শীগ্‌গির গিয়ে তার বসবার আসন পেতে দাও, এখন তো আহারের সময় হয়েছে, আর কালবিলম্ব না করে তাঁর আহারের বন্দোবস্ত করে দাও।"

পত্নীর কথা শেষ না হতেই সুপ্রিয় বুদ্ধের অভ্যর্থনার জন্য দ্রুত ফিরে যাচ্ছেন; এমন সময় সুপ্রিয়া আবার পেছন থেকে একটু বড় করে ডেকে বললেন– "ভগবান আমার কথা জিজ্ঞাসা করলে বলো যে- আমার শরীর আজ ভালো যাচ্ছে না।"

সুপ্রিয় গিয়ে বুদ্ধের জন্য যথোপযুক্ত মহার্ঘ সুন্দর আসন পেতে দিলেন এবং পদধৌত করিয়ে দিয়ে তাঁর ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করলেন। "সুপ্রিয়া কোথা গেলো, তাকে যে দেখছি না?"

প্রত্যুত্তরে সুপ্রিয় বিনীতভাবে বললেন– "ভগবন্ তার অসুখ, শরীর আজ ভালো যাচ্ছে না।" "তাকে বলো যে, আমি তার আগমন ইচ্ছা করছি; তাকে এখানে আস্‌তে বলো।"

বুদ্ধের এ আদেশের উপর সুপ্রিয়ের আর কিছু বলার সাহস হলো না। তিনি গিয়ে সুপ্রিয়াকে বললেন– "ভগবান তোমায় ডাক্‌ছেন।"

সুপ্রিয়া বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন– "তাঁকে বলোনি, আমার অসুখ হয়েছে?"

"তা তো প্রথমেই বলেছি, তবুও তোমায় ডাক্‌ছেন তিনি।"

একথা শুনেই সুপ্রিয়া চিন্তা করলেন–"বুদ্ধ যে সর্বজ্ঞ–সর্বদর্শী, তাঁর অগোচরে কিছু করা তো সম্ভব নয়।" তা মনে হতেই সুপ্রিয়া উৎফুল্ল হয়ে শয্যা ছেড়ে উঠে পড়লেন। কি জানি কিরূপে তাঁর ক্ষতস্থানের বেদনা উপশম হয়ে গেল। তারপর তিনি ধীরপদ সঞ্চালনে বিনীতভাবে ভগবৎ সমীপে উপনীত হলেন। করুণাময় তথাগত সুপ্রিয়ার প্রতি করুণা দৃষ্টি বিন্যস্ত করার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর ক্ষতস্থান সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে ক্ষতচিহ্ন মুছে গেল। কোনো প্রকার যন্ত্রণা বা অস্বস্তি আর অনুভূত হলো না। তিনি মনে করতে পারলেন না যে– মুহূর্ত পূর্বে তাঁর উরুতে অসহ্য বেদনাদায়ক তেমন কোনও প্রকার কিছু হয়েছিলো।

অনন্য সাধারণ বুদ্ধের এ মহানুভব দর্শনে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন। ক্ষণকাল পূর্বেও তাঁরা চিন্তা করতে পারেন নি

যে, সুপ্রিয়া এত সহসা এমনভাবে আরোগ্য লাভ করবেন। সম্বুদ্ধের এরূপ অলোকসামান্য মহিমাপূর্ণ মহাশক্তি অনুভব করে ভক্তি-বিস্ময়ে সুপ্রিয়ার তনু-মন বিনত হয়ে পড়ল। স্মিতহাস্যে তিনি মহামানবের চরণতলে লুটিয়ে পড়লেন। ভগবান আশীর্বাদ করলেন– "সুখী হও সুপ্রিয়া।" তারপর মহাকারুণিক করুণাঘন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করছেন– "উপাসিকে, তোমার কি অসুখ করেছিলো?"

"হ্যাঁ ভগবন্, আমার অসুখ করেছিল। কিন্তু প্রভু, অমিতাভের অমিত প্রভাবে সে অসুখ এইমাত্র সম্পূর্ণরূপে সেরে গেছে। এখন আমি পূর্বের মতোই সুস্থ আছি।"

"তুমি রোগমুক্ত হলে ভালো, কিন্তু সে রোগটা কোন্ ধরনের উপাসিকা?"

সুপ্রিয়া সমস্ত কথা প্রকাশ করে বললেন। তা শুনে বুদ্ধ এরূপ মন্তব্য করলেন– "উপাসিকে, তুমি বড়ো দুষ্কর কার্যই করেছো। মনুষ্য মাংস অভক্ষ্য।" একথা বলেই তিনি নীরব হলেন।

অতঃপর স্বামী-স্ত্রী উভয়েই সুগতের ভিক্ষাপাত্রে আহার্যবস্তু পরিবেশন করলেন। তিনি আহারে প্রবৃত্ত হলেন। আহার-কৃত্যের অবসানে দানের ফল বর্ণনা প্রসঙ্গে ধর্মোপদেশ প্রদান করে বুদ্ধ বিহারে প্রত্যাবৃত্ত হলেন।

(৯)

মুনিপুঙ্গব বুদ্ধ বিহারে উপস্থিত হয়েই ভিক্ষুগণকে তাঁর নিকট সমবেত হতে আদেশ করলেন। ভিক্ষুগণ অনতিবিলম্বে ভগবৎ সমীপে সমাগত হলে শাস্তা সেই রুগ্নভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করলেন– "ভিক্ষু, আজ তোমার শরীর কেমন আছে?"

"ভগবন্, আজ একটু সুস্থ বোধ করছি।"

আজ তুমি কি পথ্য গ্রহণ করেছো?

রুগ্নভিক্ষু শঙ্কিত-সংকোচে উত্তর করলেন– "মাংসের জুস গ্রহণ করেছি ভগবান।"

"এ জুস তুমি কোথা পেলে ভিক্ষু, কে তোমায় তা দান করলো?"

"উপাসিকা সুপ্রিয়াকেই বলেছিলাম তিনিই এ জুস পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

"তুমি জিজ্ঞাসা করেছিলে কি–এ কিসের জুস কোন্ মাংসের জুস?"

"না ভগবান, আমি কিছুই জিজ্ঞাসা করিনি। আমি জানি না, তা কোন্ মাংসের জুস।"

একথা শুনে সুগত বললেন– "জিজ্ঞাসা না করে তুমি বড়ো অবিবেচকের কাজই করেছো ভিক্ষু! তুমি কি জান, আজ তুমি উপাসিকা সুপ্রিয়ারই দেহের মাংস, তথা মনুষ্যমাংস খেয়েছো? ভিক্ষুদের পক্ষে মনুষ্যমাংস ভক্ষণ যে কতো গর্হিত কাজ, তা তোমরা নিজেরাই উপলব্ধি করতে পারো।"

শাস্তার মুখে একথা শোনা মাত্রই সে রোগজীর্ণ ভিক্ষু দুষ্কৃতকর্মের এক ভয়াবহ আতংকে শিউরে উঠলেন এবং অস্ফুট এক কাতরধ্বনি করলেন। সে সঙ্গে পরিষদের সমস্ত ভিক্ষুরও অন্তর-বাহির বিষাদের কাল-ছায়ায় ছেয়ে ফেলল।

সম্বুদ্ধ আবার বলে উঠলেন মেঘমন্দ্র স্বরে– "ভিক্ষু, তুমি জান না, বুদ্ধশাসনে ভক্তি ও সেবাপরায়ণ এমন উপাসক-উপাসিকা আছে, ভিক্ষু সংঘের জন্য তারা করতে পারে না এমন কিছুই নেই। সেবাধর্মের জন্য তারা নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খন্ড খন্ড করে কেটে দিতে পারে। এমন কি, আপন জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পারে। সুপ্রিয়ার নিকট মাংস চেয়ে তুমি বড়োই অন্যায় করেছো। দানের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও আগ্রহতিশয্যে সে বিস্মৃত হয়েছিল যে-নরমাংস নরের অখাদ্য।

"ভিক্ষুগণ, আজ থেকে এ নিয়ম ও আদেশ বিধিবদ্ধ হলো যে– কোন ভিক্ষু মনুষ্যমাংস খেতে পারবে না। কোন ভিক্ষু মাংস যাচ্ঞা করবে না নিষিদ্ধ মাংসও আহার করবে না। যে কোনো অপরীক্ষিত ও অজিজ্ঞাসিত মাংস-ভক্ষণও ভিক্ষুদের পক্ষে নিষিদ্ধ।

ভিক্ষুগণ, সুপ্রিয়া আজ অন্য মাংসের অভাবে আপন দেহের মাংস কেটে দিয়েছে। প্রয়োজন হলে, সে আত্মদানও করতে পারে। তার এমন সেবা ও ত্যাগ-সাধনা এক জন্ম-দু'জন্মের পূর্বেকার নয়, পদুমোত্তর বুদ্ধের সময়কার সাধনা। তার প্রার্থনা ছিল– 'রোগীর সেবায় সে যেন অগ্রগণ্যা হতে পারে।' আজ পূর্ণতা লাভ করেছে তার সে প্রার্থনা। সিদ্ধ হয়েছে সুপ্রিয়ার সাধনা।"

(বিনয়-মহাবর্গ)

৩। সুজাতা

(১)

ছোটকাল থেকেই সুজাতা অত্যন্ত মুখরা। স্বভাবও তার দাম্ভিক। অতুল ঐশ্বর্যের মধ্যে সে হচ্ছে লালিতা-পালিতা। মাতা পিতার অনুপম স্নেহ-মমতার মধ্য দিয়ে সে যতই বড় হতে লাগল, ততই বেড়ে উঠল তার দৌরাত্ম্য।

শ্রাবস্তীর ধন-কুবের ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর কন্যা সুজাতা, পুণ্যশ্লোকা বিশাখার কনিষ্ঠা সহোদরা। কিন্তু হলে কি হয়, বিশাখার স্বভাবের সঙ্গে সুজাতার স্বভাব কোনখানেই মিশ খায় না। বড় বোন বিশাখা ধীর, স্থির, বিদূষী, বিনীতা, শান্তশীলা ও বুদ্ধিমতী; আর ছোট বোন সুজাতা কিন্তু এর বিপরীত-মুখরা, চপলা, প্রগল্‌ভা, দুর্বিনীতা ও অভিমানিনী।

পিতা ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর ধনের তুলনা নেই। তাঁর প্রকান্ড ভবন, বড় বড় প্রাসাদ, ছোট-বড় কতো ঘর, প্রকান্ড প্রকান্ড অঙ্গন, সম্মুখে বৃহৎ সরোবর, সুন্দর পুষ্পোদ্যান, হস্তিশালায় হস্তী, অশ্বশালায় অশ্ব, গোশালায় গোধন, কতো দৌবারিক, কর্মচারী ও দাস-দাসী!

ভান্ডারে ভান্ডারে বস্ত্র, তন্ডুল, ঘৃত তৈল, আরো কতো কি! সোনারূপা, হীরা-মুক্তা, মণি-মাণিক্য কতো অপার ঐশ্বর্য। আর সেই ঐশ্বর্যের মধ্যে সুজাতার আধিপত্য রাজরাণীর চেয়েও অধিক। একজনকে ডাকলে দশজন দৌড়ায়।

বহুকোটি ধন ব্যয়ে ধনপতি ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী ঐশ্বর্যশীলা দেখিয়ে মহাসমারোহে শ্রাবস্তীর মিগার শ্রেষ্ঠীর পুত্রের সঙ্গে জ্যেষ্ঠা কন্যা বিশাখার বিবাহকার্য সম্পাদন করলেন। বিশাখার বিবাহ-ব্যাপার এক অত্যাশ্চর্য কাহিনী। জগতের লোক এখনও তা শুনলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। বিশাখাও যে কিরূপ পুণ্যবতী ও ভাগ্যবতী ছিলেন, সাধারণের তা ধারণার অতীত। বিশাখার বিবাহের সময় তাঁকে যে এক অলংকার দেওয়া হয়েছিল, সে অলংকারের নাম-মহালতা প্রসাধন। এর মূল্য লক্ষাধিক নয়, কোটি মুদ্রা। যৌতুক-সামগ্রী যা দেওয়া হয়েছিল, তার তুলনা মিলে না।

সুজাতা এখন ষোড়শী যুবতী। তার নিটোল দেহের উজ্জ্বল গৌরকান্তি ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর বিশাল ভবন আলোকিত করে তুলেছে। এক সময় শ্রাবস্তীর মহাশ্রেষ্ঠী অনাথপিন্ডিক সুজাতাকে দেখে প্রসন্ন হলেন। তার আকর্ণ-বিস্তৃত কৃষ্ণ চোখ দু'টির অপূর্ব উজ্জ্বলতার মধ্যে কেমন এক মহীয়সী ভাবের অন্যবদ্য নিদর্শন দেখতে পেয়ে তাকে পুত্রবধূ করবার জন্য অনাথপিন্ডিক ব্যগ্র হয়ে উঠলেন।

একদা তিনি ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর নিকট একথা উত্থাপন করলেন। তিনিও সাগ্রহে কন্যা সম্প্রদানের সম্মতি প্রদান করলেন। কারণ, তিনি জানেন যে, অনাথপিন্ডিক একদিকে যেমন ধনশালী ও কুলমর্যাদা সম্পন্ন, অন্যদিকে তেমনি অসাধারণ ধর্মপরায়ণ ও ত্রিরত্নের শ্রেষ্ঠ উপাসক। সুতরাং এমন ব্যক্তির পুত্রের জন্য কন্যা সম্প্রদান করতে ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর দ্বিরুক্তি করার কিছুই নেই। অনাথপিন্ডিক আনন্দিত হয়ে বিবাহের শুভলগ্ন নির্ধারণ করে উৎসব কার্যের আয়োজনে লেগে গেলেন।

ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী চিন্তা করলেন– "বিশাখার বিবাহে যত ব্যয় ও জাঁকজমক করা হয়েছে, সুজাতার বিবাহে তেমন না হলেও অন্ততঃ কিছু না করলে মানাবে কেন?" এ ভেবে তিনি কন্যার বিবাহে মহাড়ম্বরের উদ্যোগ করতে লাগলেন। যথাসময়ে মহাসমারোহে শুভ পরিণয় সম্পন্ন হলো। সুজাতা শ্বশুরকুলে যাবার সময় বহু লক্ষ মুদ্রার যৌতুক তার সঙ্গে দেওয়া হলো। তখন এমন এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শোভাযাত্রার সমারোহ শ্রাবস্তীকে আলোড়িত করে তুলল যে-সে স্মৃতি দীর্ঘকাল শ্রাবস্তীবাসীর অন্তরে বিরাজিত থেকে সুজাতার সৌভাগ্য মহিমা ঘোষণা করেছিল।

বিরাট শোভাযাত্রা ধীরে ধীরে অগ্রসর হলো। এ অপূর্ব দৃশ্য দর্শন মানসে শ্রাবস্তীর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অগণিত লোক বিস্তৃত রাজপথের উভয় পার্শ্বে ভিড় জমিয়েছে। শোভাযাত্রায় কত রকম বাদ্য; বাদ্যের সম্মিলিত ঝঙ্কারে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠেছে। কত সুসজ্জিত হস্তী, অশ্বরথ, কত বিচিত্র প্রহসন, কত মনোরম সাজে সজ্জিত পুষ্পযান ধীরে-মন্থরে অগ্রসর হচ্ছে। সুদীর্ঘ শোভাযাত্রা যেতে যেতে আর ফুরায় না।

অই দূরে দশ ঘোড়ার পুষ্পরথে নব-দম্পতি আসছে লীলায়িত গতিতে দর্শকবৃন্দের নয়ন-মন বিমোহিত করে। মহার্ঘ পরিচ্ছেদে ভূষিত বর রাজবেশে, পাত্রী রাজরাণীর বেশে। পাত্রীর গৌরতনু বেষ্টন করে একখানি অতি সূক্ষ্ম ক্ষৌমপট্ট শাড়ী, শাড়ীর প্রশস্ত দীপ্তোজ্জ্বল সোনালী পাড়, হীরা-মুক্তার অলংকার থেকে যেন বিদ্যুৎ বিচ্ছুরিত হচ্ছে, মুক্তার কর্ণভূষণ, মাথায় হীরার মুকুট, শুভ্র নিটোল কণ্ঠে উজ্জ্বল হীরা-মুক্তার হার। সকলের বিস্ময় উৎপাদন করে শোভাযাত্রা অগ্রসর হচ্ছে। পরপর আরো কত গাড়ী, কত শত লোক, তারপর বহুমূল্য যৌতুক-সামগ্রীপূর্ণ শত শত গো-শকট। দর্শকবৃন্দ বিমোহিত হয়ে প্রশংসা বাক্যে বলতে লাগল— "স্বয়ং রাজলক্ষ্মী যেন রাজভান্ডার পূর্ণ করতে চলেছেন।"

শ্রেষ্ঠীপত্নী সানন্দে নববধূ বরণ করে নিলেন। বধূর রূপ দেখে তিনি খুবই প্রীত হলেন। মনে মনে প্রার্থনা করলেন— "এ লক্ষ্মী স্বরূপিণী নববধূর গুণে আমার সোনার সংসার উজ্জ্বল হোক।" দেশবাসী নববধূকে দেখবার জন্য ভীড় জমিয়েছে। সকলেই একবাক্যে প্রশংসা করতে লাগল— "বেশ চমৎকার বৌ!"

শ্বশুর ঘরে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস অতীত হতে চলল সুজাতার দিন। তার পিতার অতুল ঐশ্বর্য্যের নিকট শ্বশুরের সম্পত্তি সামান্য হলেও উপেক্ষণীয় নয়। তবুও শ্বশুরকূলের বৈভব সুজাতার মনে সন্তোষ বিধান করতে পারল না। অনাথপিন্ডিক জেতবন বিহার প্রস্তুত করতে চুয়ান্ন কোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করেছেন, প্রতিদিন পাঁচশত ভিক্ষুর আহার্য প্রদান করেন, অনাথদের জন্য তো অন্নসত্র খোলাই আছে। এতদ্ব্যতীত তাঁর বিশাল ভূসম্পত্তি, সুবৃহৎ অট্টালিকা, কত কর্মচারী ও দাস-দাসী রয়েছে। কিন্তু তবুও মনে ভরে না সুজাতার। ধীরে ধীরে তার স্বভাবসুলভ আত্মম্ভরিতা ও প্রগল্‌ভতা উন্মুখ হয়ে উঠল। পৈতৃক সম্পত্তির গর্ব করে শ্বশুরকূলের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করতে লাগল। স্বামীর প্রতি অপ্রীতি, শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রতি অমান্যতা, তাঁদের বাক্যের উপর বাক্য প্রয়োগ এবং তার উচ্চবাচ্য ও বাদ-বিসংবাদ সকলকে শান্তিহীন ও অতীষ্ঠ করে তুলল।

শান্তিকামী-সুখবিহারী শ্রেষ্ঠী ও শ্রেষ্ঠপত্নীর সুখের স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। তাঁদের শান্তির সংসারে অশান্তি পুঞ্জীভূত হয়ে উঠল। স্বর্গীয় আনন্দ-মলিন হয়ে এল। চিন্তিত হলেন অনাথপিন্ডিক। স্বনামধন্য মহাশ্রেষ্ঠী অনাথপিন্ডিকে পুত্রবধূর কুৎসা প্রচার হওয়াই যে তাঁর মর্যাদাহানিকর, এ আশংকাই তাঁকে সবচেয়ে বিচলিত করে তুলল। অগত্যা তিনি নীরব থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করলেন।

একদিন তথাগত বুদ্ধ অনাথপিন্ডিকের গৃহে উপস্থিত হয়ে সুসজ্জিত আসনে উপবেশন করলেন। শ্রেষ্ঠীপ্রবর তাঁকে বন্দনান্তে একপাশে বসে আলাপে প্রবৃত্ত হলেন। এমন সময় অন্তঃপুর হতে কলহের উচ্চশব্দ শুনে সুগত জিজ্ঞাসা করলেন– "মহাশ্রেষ্ঠী, কৈবর্তদের মৎস্য ভাগের সময় যেরূপ কোলাহল হয়, আপনার অন্তঃপুর থেকে সেরূপ কোলাহলশব্দ শোনা যাচ্ছে কেন?"

একথা শুনে শ্রেষ্ঠীর সদাপ্রসন্ন মুখ বিমর্ষ হয়ে গেল। দুঃখের সাথে তিনি বললেন– "ভগবান্, আমার পুত্রবধূ সুজাতাই যত অনর্থের মূল। ধনকুবের ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর কন্যা কি না, তাই তার অহঙ্কার বড়ো বেশী। সে মান্য করে না শ্বশুর-শাশুড়ীকে, স্বামী করে না গ্রাহ্য, এমন কি প্রভু, আপনার প্রতিও সম্মান প্রদর্শনে সে বড়ো একটা আগ্রহী নয়। আর অন্য কথাই বা কি!"

শাস্তা তখন সুজাতাকে আহ্বান করলেন।

সুজাতা এসে তাঁকে বন্দনা করে একান্তে উপবিষ্ট হলো। ভগবান তাকে উপদেশ প্রসঙ্গে বললেন– "সুজাতা, পুরুষের ভার্যা সাত প্রকার। যথা- বধকাসমা, চৌরীসমা, আর্যাসমা, মাতৃসমা, ভগ্নীসমা, সখীসমা ও দাসীসমা। এ সাতপ্রকার ভার্যার মধ্যে তুমি কোন্ প্রকারের?"

সুজাতা বিনীতভাবে বলল– "ভগবন্, আপনি সংক্ষেপে যা বললেন, তা ভালো করে বুঝলাম না, অনুগ্রহ করে তা এমনভাবে প্রকাশ করুন, যাতে আমি সহজে বুঝতে পারি।"

বুদ্ধ বললেন– "আচ্ছা, আমি এক একটা বিষয় বিস্তৃতভাবে বলছি, তুমি মনোযোগের সাথে শ্রবণ কর–

(১) যে স্ত্রী প্রদুষ্টচিত্তা, খলস্বভাবা, স্বামীর অমঙ্গল চিন্তাকারিনী, পরপুরুষে আসক্তা, স্বামীকে অবজ্ঞাকারিনী, স্বামীর ধন-সম্পদ

অপব্যয়কারিনী, অর্থ না পেলে অনর্থকারিনী, হত্যা করার ভয় দেখায় স্বামীকে, এমন কি, হত্যা করতেও সমুৎসুক, তেমন স্ত্রীকে বধকাসমা ভার্যা বলা হয়।

(২) যে স্ত্রী স্বামীর শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষিকর্মের দ্বারা উৎপন্ন ধন-সম্পদ পরিভোগ করে, তবুও স্বামীর সম্পদ চুরি করবার ইচ্ছা করে এবং অল্প হলেও চুরি করে অর্থাৎ রান্নার সময় ধৌত করবার জন্য যে চাউল নেওয়া হয়, তার থেকেও চুরি করে, ধান্য শস্যাদির আর কথাই বা কি? সে স্ত্রীকে বলা হয়– চৌরীসমা ভার্যা।

(৩) যে স্ত্রী নিষ্কর্মা, আলস্যপরায়ণা, অধিক ভোজনকারিণী, আহার্য্য বস্তুর প্রতি অত্যধিক লোভপরায়ণা, মুখরা, প্রচন্ডা, দুর্ভাষিণী, বাক্যের উপর বাক্য বলে স্বামীকে পরাস্ত করবার চেষ্টাকারিনী ও স্বামীর উৎসাহ-উদ্যম অসহনশীলা সে স্ত্রীকে বলা হয়– আর্যা (কর্ত্রী) সমা ভার্যা।

(৪) স্বামীর সঞ্চিত ধন যে স্ত্রী রক্ষা করে, সর্বদা স্বামীর হিতকামিনী ও উপকারিণী, মাতার পুত্র-রক্ষার ন্যায় স্বামীকে রক্ষা করে, সে স্ত্রীকে বলা হয়– মাতৃসমা ভার্যা।

(৫) জ্যেষ্ঠ সহোদরের প্রতি কনিষ্ঠা ভগ্নীর আদর ও সম্মান প্রদর্শনের ন্যায় যে স্ত্রী স্বামীর প্রতি আদর সম্মান প্রদর্শন করে, স্বামীর প্রতি লজ্জানতা এবং স্বামীর অনুবর্তিনী হয়, সে স্ত্রীকে বলা হয়– ভগ্নীসমা ভার্যা।

(৬) দীর্ঘদিন পরে সখার আগমনে সখীর আনন্দিত হওয়ার মতো স্বামী দর্শনেও যে স্ত্রী আনন্দিতা এবং কুলমর্যাদা রক্ষাকারিণী, শীলবতী ও পতিব্রতা হয়, সে স্ত্রীকে বলা হয়– সখীসমা ভার্যা।

(৭) স্বামী শাসন-অনুশাসন এবং লাঠি হস্তে তর্জন-গর্জন করলেও যে স্ত্রী চিত্তদূষিত করে না বা ক্রোধ-হিংসা উৎপন্ন করে না, বরং তিতিক্ষার সাথে স্বামীর শাসন সহ্য করে এবং ক্রোধহীনা শান্তশীলা ও স্বামীর অনুগতা হয়, সে স্ত্রীকে বলা হয়– দাসীসমা ভার্যা।

তথাগত এ সাতপ্রকার ভার্যা সম্বন্ধে বর্ণনা করার পর আরো বললেন- "সুজাতা, জগতে যে সকল ভার্যা বধকা, চোরী ও আর্যাসমা হয়, মুখরা, প্রচন্ডা, দুঃশীলা, লজ্জাহীনা হয় ও পুরুষবাক্যে (কুঠারাঘাৎ

সদৃশ কথা) প্রয়োগ করে, স্বামীকে অনাদর করে ও অখাদ্য খাওয়ায়, স্বামীর রোগ হলে সেবা-শুশ্রূষা করে না, সেসব স্ত্রী মৃত্যুর পর নরকে জন্ম নিয়ে দুঃসহ দুঃখ ভোগ করে।

আর যেসব স্ত্রী মাতৃসমা, ভগ্নীসমা, সখীসমা এবং দাসীসমা, তারা মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোক সম্প্রাপ্ত হয়।

(১)

দুষ্টমতী, হিতব্রতে চিত্ত নাহি ধায়
পতির সম্পত্তি সব দু'হাতে উড়ায়
নিজ—পতি ঘৃণা করে, পর পুরুষে তরে
অথচ যাহার মন হয় উচাটন
'বধকা' সে ভার্যা ইহা বলে সর্বজন।

(২)

শিল্প বা বাণিজ্য কিংবা কৃষির শরণ
লইয়া যে'ধন পতি করেন অর্জন
নিজ ব্যবহার করে যে তাহার অংশ হবে
পতির যে কষ্ট হবে, ভাবে না কখন
'চৌরী' হেন ভার্যা ইহা বলে সর্বজন।

(৩)

কাজের নামেতে গায়ে জ্বর আসে যার
অলসা অথচ করে প্রচুর আহার
কোপনা, দুর্মুখা অতি, নাহি দয়া কারো প্রতি
দাস-দাসী জনে করে নিয়ত পীড়ন
'আর্যা' সেই ভার্যা ইহা বলে সর্বজন।

(৪)

চিত্ত যার সদা হিতব্রত পরায়ণ
পতির সম্পত্তি যত্নে করে সংরক্ষণ
যেরূপ যতনে মাতা পুত্রের পালনে ব্রতা
পতির শুশ্রূষা তথা করে অনুক্ষণ
'মাতৃসমা' হেন ভার্যা বলে সর্বজন।

(৫)

কনিষ্ঠা ভগিনী যথা জ্যেষ্ঠ-সহোদরে
নিয়ত সম্মান করে প্রফুল্ল অন্তরে
সেইরূপ যে গৃহিনী পতির বশবর্তিনী
লজ্জাবশে মুখে যার সলাজ বচন
সে ভার্যা 'ভগিনী সমা' বলে সর্বজন।

(৬)

বিলম্বে সখার সঙ্গে ঘটিলে মিলন
সখী যথা সুখী তার নেহারি' বদন-
হেরিলে পতির মুখ তেমনি যে পায় সুখ
সুজাতা সুশীলা সাধ্বী রমণীরতন
হেন ভার্যা 'সখী সমা' বলে সর্বজন।

(৭)

উৎপীড়নে অসন্তোষ না উপজে যার
দন্ড ভয়ে কম্পমান সদা দেহ তার
সুশীলা তিতিক্ষাবতী ক্রোধহীনা হেন সতী
তুষিতে পতির মন রত অনুক্ষণ
'দাসীসমা' সেই ভার্যা বলে সর্বজন।

(৮)

বধকা, প্রচন্ডা, চৌরী অতীব দুঃশীলা
দয়া-মায়া নাহি জানে গুরুজনে নাহি মানে
নরকে যাইবে সাঙ্গ করি ভবলীলা!

(৯)

জননী, অনুজা, সখী, দাসীসমা যারা
নিজের সুশীলতা বলে নিত্য সংযমের ফলে
দেহান্তে স্বরর্গে স্থান লভিবে তাহারা।

সুজাতা, তোমায় আবার জিজ্ঞাসা করছি– এ সাত প্রকার ভার্যার মধ্যে তুমি কোন্ প্রকারের ভার্যা?"

তখন সুজাতা, গম্ভীর অথচ বিনীত বাক্যে বলল– "ভগবন্, আজ থেকে আমায় স্বামীর দাসীসমা ভার্যা বলে মনে করুন। প্রভু, আমি

এতদিন ছিলাম অন্ধকারে আবৃত, এখন পেয়েছি আলোকের সন্ধান। এখন আমার ধ্বংস হয়েছে। ঐশ্বর্যের অহঙ্কার, আত্মাভিমান। করুণাময়ের কৃপায় আমার ভ্রান্তির হয়েছে নিরসন। ভগবন্, মহান বৌদ্ধ পরিবারের কুলবধূ হয়ে আমার এ বিচ্যুতির জন্য আমি খুবই লজ্জিত—অনুতপ্ত। আপনার অমৃতময়ী বাণী আমার হৃদয়ে জ্বেলে দিয়েছে জ্ঞানের আলোকবর্তিকা, পেয়েছি পথের সন্ধান। করুণাময় প্রভু, আমায় ক্ষমা করুন।" এ বলে সুজাতা সুগতের চরণপ্রান্তে লুটিয়ে পড়ল। শাস্তা আশীর্বাদ করলেন— "সুখী হও সুজাতা।"

সুজাতা সুগতের পদপ্রান্ত থেকে উঠে শ্বশুরের পায়ে মস্তক রেখে ক্ষমা প্রার্থনা করল। মহাশ্রেষ্ঠী প্রসন্ন হাস্যে পুত্র-বধূর মস্তকে হস্ত রেখে আশীর্বাদ করলেন। তারপর শাশুড়ী ও স্বামীর নিকটও এভাবে ক্ষমা চাইল সুজাতা!

সেদিন থেকে সুজাতার জীবনে এলো নববসন্ত। তার জীবনলতিকার পুরাতন দোষদুষ্ট পত্র নিচয় ঝরে পড়ল, সুশোভিত হলো সুন্দর-সুবাসিত নতুন পুষ্প-পল্লবে তার নবজীবন। যে সুজাতা ছিল-চন্ডা, মুখরা, চঞ্চলা, দুর্বিনীতা, দুর্ভাষিণী, সে সুজাতা আজ ভদ্রা, বিনীতা, শান্তশীলা প্রিয় ও মধুরভাষিণী হয়ে সকলের প্রাণে দান করল প্রীতি ও আনন্দ! তথাগত বুদ্ধের প্রভাবে আমূল পরিবর্তন ঘটলো সুজাতার। দেব-নরের শাসনকর্তা সর্বজ্ঞ বুদ্ধের এমনি মহিমাময় প্রভাব!

সম্বুদ্ধের প্রধান দায়ক, বৌদ্ধকুলের গৌরব-কেতন অনাথপিন্ডিকের পুত্রবধূ তার কুলমর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখল—রত্নত্রয়ের উপাসিকা হয়ে, দানে আত্মনিয়োগ করে শীল-সমাধি-প্রজ্ঞার অনুশীলন করে।

আনন্দময়ী-আনন্দদায়িনী সুজাতা, শ্বশুর-শাশুড়ীর অনুগতা, সুজাতা, পতিব্রতা- পতি অনুরাগিনী সুজাতা, সুভদ্রা-প্রিয়ম্বদা সুজাতা, স্নেহশীলা-করুণাময়ী সুজাতা সংসারকে মধুময়-শান্তিময় করে তুললো। আনন্দভবন আবার আনন্দমুখর হয়ে উঠল।

(অঙ্গুত্তরনিকায়ে সপ্তক নিপাত)

৪। পটাচারা

(১)

"এসেছো? এসেছো প্রিয়?"

"হ্যাঁ প্রিয়া, এসেছি। খাওয়ার পরে সবাই বিশ্রাম করছে, এ সুযোগে এদিকে ছুটে এলাম।"

"বেশ করেছো, আমি তোমার অপেক্ষায় ছিলাম।"

"কেন? আমার আর প্রয়োজন কি?"

"প্রয়োজন আছে।"

"কি প্রয়োজন?"

"কাল যে আমার বিয়ে, শোন নি?"

"তা তো শুনেছি।"

"বর আসবে পুষ্পরথে।"

"তার পর?"

"হীরা-মুক্তার অলংকার পরে, রাজরাণীর বেশে, বরের সাথে চলে যাবো শ্বশুরবাড়ী।"

"তারপর?"

"তারপর আমার দেখা আর পাবেনা।"

"কেন? সংসার ছেড়ে কোথাও উধাও হয়ে যাবে না কি?"

"উধাও হয়ে যাবো না বটে, কিন্তু তোমার সঙ্গে আর তো দেখা হবে না।"

"কেন? আর কি বাপের বাড়ি আসবে না?"

"আসবো বই কি-কালে ভদ্রে, তখন তো আমি কুলবধূ, পরপুরুষের মুখ দেখতে নেই।"

"আমি তো তোমার বাল্যসখা-খেলার সাথী!"

"সেটাই তো প্রতিবন্ধক, সবাই দেখবে সন্দেহের চোখে।"

তখন একটা দীর্ঘশ্বাস যুবকের বুক চিরে যেন বেরিয়ে গেল। চোখ হলো অশ্রুসিক্ত, কিছু বলবার শক্তি সে হারিয়ে ফেলল। অন্তরে তীব্র বেদনা অনুভব করল, মুখ বিমর্ষ হয়ে গেল।

তখন তরুণী তরুণের চিবুকে হাত দিয়ে মমতাপূর্ণ কণ্ঠে বলল– "প্রিয়া সখা, চাঁদের মতো তোমার প্রফুল্ল আনন এমন বিমর্ষ হয়ে গেল কেন? চোখেও জল কেন টল্‌মল?"

চোখ মুছে যুবক বলল– "সে কথা শুনে আর লাভ কি? তুমি বুঝবে না আমার মনের বেদনা। তোমার প্রতিটি কথা আমার অন্তরে বিদ্ধ হচ্ছে– বিষদগ্ধ শেলের মতো, সৃষ্টি করছে অসহ্য যন্ত্রণা, যা সারাজীবন আমায় দগ্ধ করবে তিলে তিলে।

"কেন, কেন সখা? কেন যন্ত্রণার সৃষ্টি করছে, কেনই বা দগ্ধ করবে তিলে তিলে!"

"কেন? তা কি তুমি জান না? আমার প্রাণে ভালোবাসার আগুন জ্বেলে দিয়েছে কে? অপরূপ মনোমোহিনী বেশে আমার শান্ত সরল অন্তরে উদিত হয়ে–কে আমায় অশান্ত-বিভ্রান্ত করে দিয়েছে? আমার মানস-সরসীতে শোভন-মোহন কমলিনীর বিরাজ করে কে আমায় বিমুগ্ধ করে তুলেছে? আজ কিন্তু আমি হয়েছি তোমার কৌতুকের সামগ্রী! এতোদিন তোমায় বুঝিনি, এখন প্রকাশ পেয়েছে তোমার স্বরূপ। বুঝেছি–তুমি কুহকিনী নারী! মায়াবিনী, তুমি পাষাণী!"

তরুণী ব্যস্ত হয়ে বলল– "না, না প্রিয়! তা নয়; আমি জানতে চাই–তোমার অন্তরের কথা, বুঝতে চাই–তোমার মনের দৃঢ়তা। বড়ো জটিল, বড়ো সংকট মুহূর্তের সম্মুখীন হয়েছি প্রিয়তম! আমি কুহকিনী নই–আমি সরলা নারী; আমি মায়াবিনী নই–আমি অবলা, তোমার অনুগ্রহ-ভিখারিণী; আমি পাষাণী নই–আমি স্নিগ্ধ-সুধার নির্ঝরিণী; একদিন পাবে আমার পরিচয়। প্রিয়তম, এখন উপায় কি? চলো আমরা পালিয়ে যাই। আমায় নিয়ে কোথাও উধাও হয়ে যাও। অরণ্যে, পর্বতে, গুহায়, কন্দরে–যেখানে তোমার ইচ্ছা; পারবে কি?"

তরুণীর কথা শুনে যুবক অবাক হয়ে তার প্রতি চেয়ে রইল।

তরুণী বল্‌ল গাঢ়স্বরে– "কি, পারবে না?"

ক্ষুব্ধস্বরে বল্‌ল তরুণ– "কৌতুক করছো না তো?"

"কৌতুক নয় প্রাণেশ্বর, আমার অন্তরের কথা"

বিস্ময় নেত্রে চেয়ে যুবক বলল– "কি যে বলছো তুমি, কিছুই বুঝতে পারছি না! চিন্তা করে কথা বলো। আমি হলাম অজ্ঞাত কুলশীল অনাথ, নিতান্ত দরিদ্র, তোমাদের আশ্রিত-সেবক। আর তুমি হলে ধনীর দুলালী, যূথিকা স্তবকের মতো সুন্দরী যুবতী, ফুলের মতো কোমল দেহ, সুখে বর্ধিত, তোমার বরাঙ্গের সজ্জা হীরা-মুক্তার অলংকার, পরিধানে সূক্ষ্ম পট্টবসন, সুবাসিত তৈলে সিক্ত করা হয় তোমার ভ্রমর-কৃষ্ণ সুদীর্ঘ কেশরাশি। রাজপুত্রের মতো বর আসছে তোমার–যার অপার ঐশ্বর্য, কতো দাস-দাসী, গাড়ী-ঘোড়া। খাবে রাজভোগ, থাকবে রাণীর সুখে। আমার ন্যায় নিঃস্ব-কাঙ্গালের সঙ্গে তুমি যাবে কোথায়? কোন সুখেই বা থাকবে? এ কি তোমার পরিহাস? পরিহাসেরও একটা সময় আছে!"

"পরিহাস! অমন কথা বলো না প্রিয়তম। তা শুনলে প্রাণে বড়ো ব্যথা পাই। আমি ধন-মান, ঐশ্বর্য কিছুই চাই না, চাই না হীরা-মুক্তা, চাই না হর্ম্য-প্রাসাদ, দাস-দাসী। আমি চাই তোমায়, তুমিই আমার ঐশ্বর্য, তুমিই আমার মণি-মুক্তা, তুমিই আমার অঙ্গের ভূষণ, তুমিই আমার আনন্দ, তুমিই আমার সুখের উৎস। বাল্যসখা, তুমি চন্দ্র-আমি চন্দ্রিকা; তুমি অনন্ত আকাশ-আমি আকাশ-গাত্রে সৌদামিনী; তুমি সরোবর-আমি সরোবর-আশ্রিতা কমলিনী। তোমায় দিয়েছি-আমার মন-প্রাণ, রূপ-যৌবন, আমার দেহ, আমার সর্বস্ব। আর এমন কিছুই অবশিষ্ট নেই– যা দিতে পারি অপরকে। সবই তো উজাড় করে তোমায় দিয়েছি। তুমিই আমার ধর্ম, তুমিই আমার পুণ্য, তুমিই আমার কাম্য, আমি চাই একমাত্র তোমাকেই।"

"সত্যি, সত্যি প্রিয়া? যা শোনালে, তা কি তোমার সরল অন্তরের একান্ত সত্যি কথা?"

"হ্যাঁ প্রাণনাথ! সত্যি, আমার সরল অন্তরের তা একান্তই সত্যি কথা। চল সখা, আমরা পালিয়ে যাই। বিলম্বের আর সময় নাই। আজ রাতের অবসানে, ভোরের অন্ধকারেই এ দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে।"

"কিন্তু প্রিয়া, তোমার বাবা কি আমায় ক্ষমা করবেন? তিনি আমায় নিশ্চয়ই হত্যা করবেন।"

"সখা, আমরা পালিয়ে যাবো, উধাও হয়ে যাবো, দূর-দূরান্তরে চলে যাবো—এ দেশ ছেড়ে অন্য দেশে।"

"সখি, আমার ভয় হচ্ছে; দেখো আমার বুকে হাত দিয়ে, কেমন ধুকধুক করছে।"

তরুণী যুবকের বক্ষে হাত দিয়ে বলল— "আমার জীবন-সাথী, বুকে সাহস আনো। পুরুষ মানুষের অত ভয় করলে চলে? উদ্যোগী পুরুষ সিংহ। মনকে দৃঢ় কর। আমরা লুকিয়ে যাবো, নিখোঁজ হয়ে যাবো, কোনও ভয় নেই। তুমি প্রস্তুত হও। কাল ভোর-রাতের আলো-আঁধারীতে আমি এসে তোমার সঙ্গে একত্র হবো। বলো, তখন তুমি কোথায় থাকবে, আমার জন্য কোথায় অপেক্ষা করবে?"

যুবক চিন্তাযুক্ত হয়ে বলল— "প্রিয়া, তুমি যে কী ভয়ংকর কথাই বলছো, তা আরো একটু সূক্ষ্ম বুদ্ধি দিয়ে চিন্তা করে দেখো। আমার সঙ্গে গিয়ে প্রথমেই তোমাকে বরণ করতে হবে দারিদ্র্য। নিঃস্ব অবস্থা দুঃখ ভারাক্রান্ত করে তুলবে জীবনকে। তা হবে তোমার পক্ষে দুর্বিসহ। অভাব-অনটনের যে কি দুঃখ, তা তো জীবনে উপলব্ধি করতে পারো নি। তোমার দৈন্যদশা আমার প্রাণে সহ্য হবে না। এখনও সময় আছে, চিন্তা কর। বুদ্ধিমানেরা কাজ করবার পুর্বেই চিন্তা করে, বিচার করে।"

"আমি সানন্দে যা বরণ করে নিচ্ছি, তাতে তোমার অসহ্য হবার কি আছে? তুমি অত চিন্তা করে মাথা খারাপ করো না প্রিয়া!"

"বাড়ী থেকে তুমি কিরূপে বের হবে? বিবাহ বাড়ী—কতো লোকজন, দাস-দাসী, কর্মচারী। দ্বারে আছে প্রহরী। এ ব্যূহচক্র ভেদ করবে কি করে?"

"সে চিন্তা আমার, সেজন্যে তুমি মাথা ঘামিও না।"

"প্রিয়ে, বিপদের খুব সম্ভাবনা, অসম্ভব মনে হলে বের হয়ো না। আর যদি বের হয়ে পড়, নগরদ্বারের কিছু দূরে যে একটা প্রকান্ড বটবৃক্ষ আছে, তার অন্তরালে আমি গা ঢাকা দিয়ে থাকবো, সেখানেই এসো। কিন্তু সাবধান, ধরা পড়লে আর রক্ষা নেই। তুমি তো মা-বাপের আদরিণী কন্যা, তোমার কিছুই হবে না; হবে এ অনাথের সর্বনাশ। হয় শূলে দেবে; না হয়, বিষ দিয়ে মারবে।"

"প্রিয় সখা, সে ভয় করো না। তোমায় মরতে দেবো না। তুমি মরলে-আমারও হবে সহমরণ, এটা নিশ্চয়। একদিন তো মরতেই হবে। এখন যাও, গমনের জন্য প্রস্তুত হও গে। আমিও প্রস্তুত হচ্ছি।"

(২)

আড়াই হাজার বৎসর আগেকার কথা। পুণ্যভূমি শ্রাবস্তী নগর। সেখানে ছিলেন এক ধনাঢ্য ব্যক্তি। তাঁর ধনের পরিমাণ চল্লিশ কোটির উপর। তাঁর প্রকান্ড অট্টালিকা, বহু হস্তী-অশ্ব-রথ-শকট। চতুর্দিকে প্রাকার বেষ্টনী। বহির্দ্বারে সশস্ত্র প্রহরী।

এ ভাগ্যবান লোকটি ও তাঁর সহধর্মিনী দীর্ঘদিন যাবৎ পুত্র-কন্যার অভাব বোধ করছিলেন। তাই তাঁরা ততদিন সর্বতোভাবে সুখী হতে পারেন নি। পরিশেষে বহু সাধনার ফলে লাভ করলেন এক কন্যারত্ন। আনন্দিত হলেন জনক-জননী। কন্যাটির প্রতি তাঁদের অগাধ স্নেহ-মমতা। কন্যাটি বর্ধিত হলো পরম যত্নে ও সুখে। সে ছিল দেবী প্রতিমার মতো সুন্দরী। তাঁর চোখে-মুখে প্রতিভার উজ্জ্বল দীপ্তি। মাতা -পিতা আদর করে তাকে ডাকতেন-মণি।

পাঁচ বৎসরের পরের কথা। হেসে-খেলে মণির দিন কেটে যায়। ধনীর দুলালী মণির এমন একটা বাসভবন হওয়া চাই—তা যেন হয় অতি সুন্দর-মনোরম, আলো বাতাস ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে পরিপূর্ণ। অচিরে প্রাসাদ তৈরী হলো, দিব্য বিমানের মতো। সজ্জিত হলো চারুশিল্পে। চারপাশে রচিত হলো সুন্দর পুষ্পোদ্যান। মণি ফুল দেখে খুশি হয়, উদ্যানে খেলা করে মহানন্দে। ফুলের সাথে সে কথা কয়, হাসে, অভিমান করে। ফুলগুলিও যেন প্রফুল্ল হয়ে হাসে, তার কোমল হাতের স্পর্শ পেয়ে ফুলের সর্বাঙ্গে যেন বয়ে যায় আনন্দের হিল্লোল। যূথী, মালতী, কামিনী, মাধবী ও মল্লিকা প্রভৃতির সঙ্গে সে যখন সখিত্ব পাতায় তখন তাদের সঙ্গে সে মিলে যায়, সেও যেন সুন্দর এক কুসুম-স্তবক।

এমন সময় এই সুখী পরিবার আলো করে এলো এক সুন্দর পুত্র সন্তান। তখন মণির আনন্দ কে চায়! শিশু-ভাইটিকে সে আগ্‌লিয়ে রাখে সারাক্ষণ। কখনো কোলে নিতে চায়, কখনো ছোট ছোট আঙ্গুল নিয়ে খেলা করে, কখনো নাক টেনে দেয়, কখনো ললাটে চুম্বন দেয়,

হেসে হেসে লুটিয়ে পড়ে, আনন্দে মাকে বলে– "মা, খোকনমণি আমায় ডাকবে–দিদিমণি, কেমন তাই না?"

মা মৃদু হেসে বলেন– "হ্যাঁ মা, ডাকবে। তোরা ভাইবোন আমার বুক জুড়িয়ে সোনার সংসার উজ্জ্বল করে বেঁচে থাক।" এ বিশাল ভবনে এ দু'জন মাত্র ভাই-বোন। তাদের দেখলে জনক-জননীর অন্তর যেন পরম শান্তি ও তৃপ্তিতে ভরে উঠে। তাঁরা সকল দিক দিয়েই সুখী। সুখের দিন তাঁদের সুখেই কেটে যাচ্ছে।

(৩)

এক দরিদ্র বালক। ছেলেটি পিতৃ-মাতৃহীন অনাথ। তার বয়ঃক্রম আট কি নয় বৎসরের মতো। পরিধানে ছিন্নমলিন একখানা ছোট কাপড়; ময়লা-মলিন শরীর, দেহ শীর্ণ, মুখ পাংশু-বিশুষ্ক। এর মধ্য দিয়েও তার দেহকান্তি যেন উঁকি মারছে। তার চোখ-মুখ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুলক্ষণ যুক্ত। দেখলে ছেলেটির প্রতি স্বতঃই করুণার সঞ্চার হয়।

সেদিন শ্রাবস্তীর সেই ধনপতি কর্মস্থান থেকে ফিরছিলেন নগর পথে। সম্মুখে দেখতে পেলেন তিনি এই অনাথ ছেলেটিকে। ছেলেটি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সে সম্মুখে এসে হাত পেতে বলল–"বাবা, একটা পয়সা দেবেন? বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে।"

শ্রেষ্ঠীর অন্তরে করুণার সঞ্চার হলো। তিনি করুণা বিগলিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন– "তোর বাড়ী কোথায় রে?"

"আমার তো কোনো বাড়ী নেই বাবা।"

"রাতে ঘুমাস কোথায়?"

"কারো ঘরের দেহলীতে।"

"তোর মা-বাবা কোথায়?"

"তারা কেউ বেঁচে নেই।"

"তুই আমার সঙ্গে যাবি?"

"কোথায় বাবা?"

"আমার বাড়ীতে।"

"খেতে পেলে বাবা, যেখানে হোক যেতে পারি।"

"তবে আয়।" বলে তাকে তিনি সঙ্গে করে গৃহে নিয়ে এলেন। স্নানের পর যখন ছেলেটিকে পরিস্কার কাপড় পরিধান করানো হল,

তখন তার দেহের স্বাভাবিক উজ্জ্বলকান্তি ফুটে উঠল। তাকে প্রথম দেখেই ভালো লাগল মণির। বাবাকে সে জিজ্ঞাসা করল—"কে এ বাবা?"

উত্তর হলো—"তোমার খেলার সাথী।"

মণি হেসে বলে উঠল—"বেশ হয়েছে বাবা, আমার খেলার সাথী একটা জুটে গেল। দু'জন না হলে কি খেলা করা যায়? একলা মোটেই ভালো লাগে না বাবা।"

"ছেলেটি ভালো খাবার পেয়ে কিছুদিনের মধ্যেই সুগঠিত ও সুন্দর হলো। মণি তাকে পেয়ে খুবই আনন্দিত হলো! তার কথা, তার হাসি, তার চাহনি, তার অঙ্গভঙ্গী, তার ভ্রুবিলাস বড়ো মনোরম, বড়ো মিষ্টি মনে হলো। অল্পদিনের মধ্যেই বালিকার অন্তর অধিকার করে বসল বালকটি। তারা একসঙ্গে বসে, একসঙ্গে বাগানে লুকোচুরি খেলে, ছুটাছুটি করে, কতো হাসে, কতো আনন্দ করে। মণি তাকে ডাকে আদর করে- "সখা, বন্ধু, খেলার সাথী।" সে ডাকে—"সখি, সই, মণি।" মাতা-পিতা মেয়ের আনন্দ দেখে সুখী হন, তৃপ্তি অনুভব করেন। বালকটির প্রতি তাঁদের আদর মমতা বৃদ্ধি পায়।

(৪)

মণির বয়স এখন চৌদ্দ বৎসর। তার বাল্যসাথী এখন আঠার বৎসরের যুবক। তাদের ক্রীড়া কৌতুক এখন অনেকটা সংযত হয়ে এসেছে। কিন্তু মণির অন্তরে তার প্রতি কেমন একটা আকর্ষণ এসে পড়েছে। তার সখাকে ক্ষণকাল না দেখলে সে অস্বস্তি বোধ করে, নিরানন্দের ছায়া পড়ে তার মর্মস্থলে। নানা অজুহাত ও খুঁটিনাটি কাজ করিয়ে তাকে রাখতে চায় চোখের সম্মুখে। তবুও তাকে বাইরের কাজেই অধিক সময় ব্যস্ত থাকতে হয়। এরূপে চলে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। অনুরাগের গাঢ় রেখা অংকিত হলো উভয়ের মানস পটে।

মণি এখন ষোড়শী যুবতী। যৌবনের উজ্জ্বল লালিত্য বিকশিত হয়ে ওঠে তার সর্বাঙ্গে, মনও হয় অনুরাগে রঞ্জিত, কামনা-বাসনায় বিভাসিত-অভিভূত। যৌবনের উন্মাদনায় কামিনীগণ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য

হয়ে পড়ে। অপসারিত হয় লজ্জা-ভয়-আত্মমর্যাদা বোধ। যুবতী মণির মোহনী মায়ার মোহনপাশে আবদ্ধ হয়ে পড়ল নবীন বাল্য সখা।

সে এখন মণিগত প্রাণ। প্রিয়াকে প্রসন্নময়ী দেখলে তার আনন্দের সীমা থাকে না। মণির আশা আকাঙ্খা মিটাতে পারলে– সে তৃপ্ত হয়, তুষ্ট হয়। কামিনী কামানলে হলো তাপিত, সন্তাপিত, বিচলিত। বিলাসিনীর বিলাস-চাঞ্চল্যে মোহিত হয়ে সে অনলে ঝাঁপিয়ে পড়ল তরলমতি যুবক। কামিনীর কামনা হলো চরিতার্থ। মণির ললাট-লিপিটে ঘোর কৃষ্ণ-মসীর রেখাপাত হলো। আর যুবকের? তার কর্মের ফল আরো ভয়ঙ্কর। বড় অশুভক্ষণেই ঘটেছিল তাদের প্রথম দৃষ্টি-বিনিময়।

(৫)

শ্রাবস্তীর অপর এক ধনাঢ্য ব্যক্তি। তিনিও শ্রেষ্ঠী নামে খ্যাত। সম্ভ্রান্ত কুল, সুখী পরিবার। তাঁর ছিল এক বিবাহযোগ্য পুত্র। যুবকটি যেমন সুদর্শন, তেমনি শিক্ষিত ও অমায়িক। তার জন্য মনোনীত করলেন লাবণ্যময়ী মণিকে। বরের পিতা প্রার্থী হয়ে উপনীত হলেন কন্যার পিতার নিকট। পরিচিত লোক, সমজাতি ও সম অবস্থা সম্পন্ন। মণির পিতা সানন্দে সম্মত হলেন। শুভ বিবাহের শুভলগ্ন নির্ধারিত হলো। উভয়েই ধনাঢ্যকুল। সাড়ম্বরে বিবাহ উৎসবের প্রস্তুতি চলতে লাগল। বাদ্যমঞ্চ প্রস্তুত হলো, সুন্দর পুষ্পতোরণ নির্মিত হলো, বিবাহ-উৎসরের সর্বাঙ্গীন কার্য সম্পাদনের জন্য হুলস্থুল পড়ে গেলো।

মণি নীরবে শুনলো সকল কথা। কিন্তু এ বিবাহে তার মন সায় দিল না। তার হৃদিসমুদ্রে ঝড় উঠল, অন্তরে সৃষ্টি হলো মহাবিতর্কের। চিন্তা করল দৃঢ়ভাবে–"তা কক্ষণো হতে পারে না। আমি যাকে সমর্পণ করেছি মন-প্রাণ, রূপ-যৌবন, যাকে করেছি আত্মদান–আমি তাকেই চাই। চাই না আমি ধন-সম্পদ, মান-সম্মান, হীরা-মুক্তা, মণি-মাণিক্য, চাই না হর্ম্য-প্রসাদ, চাই না দাস-দাসী, গাড়ী-ঘোড়া, চাই না অন্য পুরুষ–যদিও সে হয় দেবতুল্য।

আমি যাঁকে স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছি– তিনিই আমার একমাত্র স্বামী, তিনিই আমার দেবতা, তিনিই আমার প্রাণেশ্বর, তিনিই আমার ধন-রত্ন, তিনিই আমার মান-সম্মান, তিনিই আমার ধ্যান-ধর্ম, তিনিই

আমার স্বর্গ, তিনিই আমার সর্বস্ব। অন্য পুরুষ আমার পক্ষে পিতৃসম, ভ্রাতৃসম। এর অন্যথায় আমি হবো দ্বিচারিণী, ব্যভিচারিণী, অধর্মপরায়ণা। আমি মানুষের কাছে দোষী হতে পারি, কিন্তু ধর্মের কাছে দোষী হতে পারি না। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর চললে—তখন আমি সানন্দে বরণ করে নেবো মৃত্যুকে। জীবনপণ করে রক্ষা করবো আমার ধর্ম-সতীত্ব ইত্যাদি কতো অনন্ত চিন্তা তার।

দিন ঘনিয়ে এলো। আগামীকাল মণির বিয়ে। চলন্ত বিয়ে। রাত্রে পুষ্পরথে করে আসবে বর আলোকিত করে দীপমালায়। মহার্ঘ যৌতুক-সামগ্রীতে ঘর ভর্তি করা হয়েছে। ঐকতান বাদ্যের সুতান-লহরী আকাশ-বাতাস মুখর করে তুলছে। বাঁশরীর ললিত-বেহাগ রাগিণীর করুণ-মধুর সুর প্রাণ আকুল হয়ে তুলছে। বিচ্ছেদ বিধুর চোখ বার বার সজল হয়ে উঠছে। মণির মাতার অশ্রু কিছুতেই বাধ মানছে না। পিতাও যথেষ্ট কাতর হয়ে পড়েছেন।

দিবা দ্বিপ্রহর। মণি আপন প্রকোষ্ঠে নির্জনে পালংকে শুয়ে কি সব চিন্তা করছে। সে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। এমন সময় অনাথ যুবকটি সেখানে উপস্থিত হলো। তাকে দেখেই মণি তাড়াতাড়ি উঠে 'এসেছো, এসেছো প্রিয়?' বলতে বলতে গিয়ে তার একখানা হাত ধরল। তারপর উভয়ের মধ্যে যা কথোপকথন হয়েছিল, পাঠকগণ তা পূর্বেই অবগত হয়েছেন।

(৬)

দিবাকর অস্তাচলে হেলে পড়েছে; মণি আপন শয্যায় শুয়ে আছে। নির্জন প্রকোষ্ঠ। সে কত চিন্তা করছে আকাশ-পাতাল। এমন সময় সে শুনতে পেলো তার পাশে উদ্যানে করুণ সুরে গান করছে তার স্নেহের ছোট ভাই শোভন।

তার গানের সুর-ভাষা বড় করুন। বিয়ের পর যদি দিদি শ্বশুরবাড়ী চলে যাবে। একাকী সে এই বিরাট ভবনে কেমন করে থাকবে? দিদির আসন্ন বিদায়লগ্ন স্মরণ করেই তার অন্তরে নিবিড় বেদনা-সঞ্চার হয়েছে। সেই দুঃসহ বেদনাই সঙ্গীত হয়ে তার কণ্ঠ থেকে ঝরে পড়ছে। গান শুনতে শুনতে মণির চোখেও অশ্রু ঘনিয়ে উঠল।

গান থামল। মণির নয়ন যুগল অশ্রুসিক্ত হলো এমন সময় "দিদিমণি, দিদিমণি" বলে শোভন দ্রুত প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করল। শোভন এখন দশ বৎসরের বালক। সুন্দর লাবণ্যমাখা দেহ। সে এসে পালংকে বসল তার দিদির কাছে। সে বলল– "দিদিমণি, উদ্যানে তোমায় খুঁজে না পেয়ে এখানে ছুটে এলাম, এ সাঁঝের বেলায় তুমি শুয়ে আছো কেন দিদি! অসুখ করেছে?"

"না ভাই শোভন" বলে মণি উঠে বসে আদরের ছোট ভাইকে বুকে জড়িয়ে ধরলো।"

শোভনও দিদিকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠে বলল– "দিদিমণি, আমার প্রাণ কেমন করছে, আমায় ছেড়ে তুমি কেমন করে যাবে দিদি! তোমার প্রাণও কেমন করছে, না? দিদিমণি, আমি কা'কে দিদিমণি ডাকবো? কে আমায় তোমার মতো আদর করবে? একলা আমি কেমন করে থাকবো? আমার মোটেই ভালো লাগবে না দিদিমণি?"

মণির চোখে অশ্রুর বন্যা নেমে এলো। তার দু'গন্ড বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। কেঁদে কেঁদে বলল– "প্রাণের শোভন, ভাই আমার, আমি আবার আসবো, তোমায় আদর করবো, কোলে নেবো, আমাকে ডাকবে দিদিমণি, তুমি কেঁদো না।"

"তুমিও তো কাঁদছো দিদি, প্রাণ জ্বলছে, না? জ্বলবেই তো, আমরা আছি মোটে দুই ভাই-বোন, যেন এক বৃন্তে দু'টি কুসুম। আমার বুকে হাত দিয়ে দেখো দিদি, প্রাণ কেমন হু হু করে কাঁদছে।"

অনুরাগরূপ কালসর্প তীব্র বিষ উদ্‌গার করে। রিপুপীড়িত জনগণ হয় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য, ব্রতী হয় অসাধ্য সাধনে, মহাদুঃখকে করে আলিঙ্গন, হয় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যায়ও তাদের নিদ্রা হয় না।

মণির অবস্থাও হলো তাই। সে যাপন করল বিনিদ্ররজনী, ভীষণ সংকল্পে হলো বদ্ধপরিকর, চলতে লাগল মন-প্রাঙ্গণে দুর্জয় সংগ্রামে- পরাভূত হলো মাতা পিতার স্নেহ-মমতা, ভ্রাতার প্রতি আদর-ভালোবাসা, কুলগৌরব, আত্মমর্যাদা। বিজয়িনী তার বেশ পরিবর্তনে প্রবৃত্ত হলো। তখন রাত্রির শেষ প্রহর। পরিধান করল একখানা জীর্ণ মলিন বস্ত্র। মাথায়, মুখে, হাতে ও পায়ে মাখল ছাই। নিজের মূল্যবান

অলংকার ও কয়েক খানা শাড়ী মাত্র সঙ্গে নিয়ে, দাসীর মতো বেশ ধরে, ভাঙ্গা একটা টুকরী কাঁধে নিয়ে গোপন গবাক্ষ পথে গৃহত্যাগ করল।

নগরদ্বার অতিক্রম করে বটবৃক্ষের ছায়ায় একত্র হলো তার প্রিয়তমের সঙ্গে। তারপর তারা উভয়ে দ্রুত পথ অতিক্রম করতে লাগল। শ্রাবস্তীর প্রান্তসীমায় সম্প্রাপ্ত হলো বিস্তীর্ণা অচিরাবতী নদী। এতে জল মাত্র জানু প্রমাণ। তারা অক্লেশে নদী উত্তীর্ণ হলো। চলতে লাগল দ্রুতগতিতে। বহুদূর গিয়ে উপনীত হলো অরণ্যময় বন্ধুর প্রদেশে।

একপদী কঙ্কর যুক্ত পথ। দিবা দ্বিপ্রহর। রৌদ্রের প্রখর তাপ। মণি অসাধ্য সাধনে অগ্রসর হয়েছে। ধনীর আদরিণী কন্যা, সুকোমল শরীর, সুখে বর্ধিত। দূর পথ পায়ে হাঁটায় অনভ্যস্ত, ঘর্মে সিক্ত হয়েছে তার দেহ ও পরিহিত বস্ত্র। স্নিগ্ধ কোমল মুখমন্ডল হয়েছে জবা ফুলের মতো টকটকে লাল। কঙ্করময় অসমতল অরণ্যপথ অতিক্রম করা তার পক্ষে বড়ো কষ্টসাধ্য। পদতল ক্ষতবিক্ষত হয়ে বেদনার সৃষ্টি করছে।

যুবক তার প্রিয়তমার প্রতি এক একবার তাকিয়ে দেখে। ওর অবস্থা দেখে তার অন্তরে অনুভব করে বেদনা এবং ভাবে– "এ মা-বাপের কতো আদরের দুহিতা, সুখে বর্ধিতা। আহা, এ বিলাসিনী-কোমলাঙ্গিনী নবীনা নারী এ অভাগাকে ভালোবেসে এতো দুঃখ ভোগ করছে! এখন একটু বিশ্রাম করা প্রয়োজন।" এই মনে করে সে তরুণীকে বলল– "প্রিয়া, এখন একটু বিশ্রাম করা যাক।" দু'জনে ঘন ছায়াযুক্ত এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করল। যুবকটি বৃক্ষের কয়েকটা পল্লব নিয়ে প্রিয়াকে বীজনে প্রবৃত্ত হলো। তরুণীর ললাট ও মুখ থেকে অজস্র ঘর্ম বিন্দু ঝরে পড়তে লাগল। বস্ত্রাঞ্চলে স্বেদকণা মুছে সে হেসে বলল– "প্রিয়তম, তোমায় দেখছি, এরই মধ্যে প্রিয়তমাকে স্বস্তি ও আনন্দ দান করতেও শিখেছো।"

তরুণ বলল মৃদু হেসে– "প্রিয়সখি, বাল্যকাল থেকে তুমিই তো শিখিয়ে এসেছো-প্রিয়তমার কিরূপে করতে হয় আনন্দ বর্ধন। তুমিই তো গুরু স্বরূপা।"

তরুণী জিহ্বায় কামর খেয়ে বলল– "মাণিক আমার, অমন কথা বলতে নেই। তুমি আমার স্বামী, গুরু, প্রাণেশ্বর। পত্নীকে গুরু বলতে আছে? আমায় দোষী করলে, তজ্জন্য তোমার পায়ে প্রণাম জানাচ্ছি।"

যুবক আশ্চর্য হয়ে বলল– "আমি এতদূর অন্যায় বলে ফেললাম! আচ্ছা, এমন ভুল আর হবে না। কিন্তু, আমি বুঝতে পারিনি– 'স্বামী, গুরু ও প্রাণেশ্বর' এসব গুরুত্বপূর্ণ পদের যে আমি অধিকারী হয়ে বসেছি।"

"হ্যাঁ স্বামিন্, সেদিনই ধর্মসাক্ষী করে অনন্যমনে তোমায় বরণ করে নিয়েছি। আমি লোকাচার মানি না, আমি মানি ধর্মকে। অন্তরে এক-মুখে অন্য তা আমি অন্তরের সাথে ঘৃণা করি। অন্তরের অন্তঃস্থলে যে সত্য নিহিত আছে আমি তারই পূজারিণী। সততাই মানবত্বের মূল ভিত্তি।"

যুবক সবিস্ময়ে বলল– "তাই না কি!"

যুবতী বলল দৃঢ়তার সাথে– "নিশ্চয়ই তাই। তা না হলে, আমার পক্ষে আজ এতো বড়ো মহান ত্যাগ সম্ভব হতো না। আমি জানি, তোমাকে অবাধ-নিবিড়ভাবে পেতে হলে–ত্যাগের মাধ্যমেই পেতে হবে।"

সব শুনে যুবক অবাক হয়ে গেল। তখন এক অনাবিল শান্তি ও তৃপ্তিতে তার হৃদয় ভরে উঠল। পত্নীপ্রেমের জোয়ার যেন তার প্রাণের দু'কূল ছেপে প্রবাহিত হলো। তাকে নীরব দেখে মণি বলল– "প্রিয়তম, আমাদের আর কতদূর যেতে হবে?"

যুবক বলল– "এ দীর্ঘ পথ হেঁটে খুব কষ্ট বোধ করছো, না।"

মৃদু হেসে তরুণী বলল– "প্রিয়তম, তুমি যেখানে-সেখানেই তো আমার শান্তি এবং সুখ। দুর্লভ বস্তু পেতে হলে, দুঃখের মাধ্যমেই তো পেতে হয়। দুঃখের পেছনে রয়েছে অনন্ত সুখ। আমি যা সানন্দে-সাগ্রহে বরণ করে নিয়েছি, সেখানে দুঃখের কথা আসতে পারে না। এসব কথা এখন থাক, কোন দিকে যাবে, যাওয়া যাক। আর কতদূর যেতে হবে, কোথায় বসতি স্থাপন করা হবে, তা তো বললে না?"

যুবক বল্‌ল, "আমি ভাবছি তোমার ভাব-গম্ভীর কথাগুলো। তোমার কথা কিন্তু খুব চমৎকার!"

"হয়েছে, আর প্রশংসা করতে হবে না। তোমায় কি জিজ্ঞাসা করলাম তাই, বলো না।"

"আমরা কোথা যাবো, সে কথা? যে দিকে যাচ্ছি, সে দিকেই যেতে থাকবো সন্ধ্যা পর্যন্ত। তখন যে গ্রাম পাবো, সে গ্রামেই হবে আমাদের বসত বাড়ী। এখন চল প্রিয়ে, আরো অনেক দূর যেতে হবে।" এ বলে উভয়ে আবার চলতে আরম্ভ করল।

(৭)

আজ কন্যা সম্প্রদানের দিন। তাই শ্রেষ্ঠীভবনের সর্বত্র চলছে উৎসব কার্যের সাড়ম্বর প্রস্তুতি। প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গেই ঐকতান-মঞ্চে বাদ্যভান্ড বাজতে আরম্ভ করল। মণির পিতা সর্বত্র গিয়ে পরিদর্শন করছেন এবং কাজের নমুনা দিচ্ছেন। কর্মচারীরা কাজে বড় ব্যস্ত।

বেলা অনেক হয়েছে। মণির প্রকোষ্ঠদ্বার এখনও বন্ধ। সে যাবার সময় বুদ্ধি করে জানালা দিয়েই বের হয়ে গিয়েছিল। শোভন এসে "দিদিমণি, দিদিমণি" বলে ডাকতে লাগল, আর দ্বারে করাঘাত করতে লাগল। কিন্তু, দিদির কোনও সাড়া না পেয়ে, সে গিয়ে বল্‌ল মাকে— "মা, দিদিমণি এখনো যে উঠছে না! এতো ডাকলাম, তার কোনও সাড়া নেই!"

মাতা অবাক হয়ে বল্‌ল— "কি, এখনো ওঠেনি!"

"তুমি গিয়ে দেখো মা, কাল কিন্তু, দিদি খুব কেঁদেছিল।"

শ্রেষ্ঠী পত্নী হাতের কাজ ফেলে রেখে তাড়াতাড়ি গিয়ে মণি, মণি, বলে বারবার ডেকে যখন সাড়া পেলেন না, তখন তিনি গিয়ে স্বামীকে বললেন— "দেখতো মেয়ের কান্ড, তার ঘুম তো আজ ভাঙ্গছে না! এতো ডাকলাম, কোনও যে সাড়া নেই!"

শ্রেষ্ঠী বিরক্ত হয়ে বললেন— "কি বলছো? রাতে হয় তো ঘুম হয়নি, একটু বেলা করে ঘুমাচ্ছে আর কি!"

"বেলা কি কম হয়েছে? আর অতো ঘুমোতে হবে না, তুমি গিয়ে জাগিয়ে দাও গে। আমার মন কিন্তু কেমন করছে। রাতের কি সব

দুঃস্বপ্ন আমার মন কেমন ভারি করে তুলেছে। যাও, শীগ্‌গির ওকে তুলে দাও।"

পত্নীর কথা শুনে শ্রেষ্ঠীর প্রাণ কেঁপে উঠল। পুত্র-কন্যার অমঙ্গল আশংকা করাই মাতা-পিতার স্বভাব ধর্ম। তিনি দ্রুত গিয়ে "মা মণি, মা মণি" বলে বারবার ডাকলেন এবং দ্বারে করাঘাত করলেন। কিন্তু, কোনও সাড়া নেই। তিনি চিন্তাযুক্ত ও আতঙ্কগ্রস্ত হলেন। শোভন প্রকোষ্ঠের চারধারের জানালায় করাঘাত করে ডাকতে লাগল। পালংকের পাশের জানালাটায় হাত দিতেই তা খুলে গেল। সে দেখল প্রকোষ্ঠে কেউ নেই, পালংক শূন্য। তার বাবাকে ডেকে বলল– "বাবা, এদিকে জানালা খোলা রয়েছে, দিদিকে তো দেখছি না।" এ বলে প্রকোষ্ঠে ঢুকে দ্বার খুলে দিল। শ্রেষ্ঠী প্রকোষ্ঠে ঢুকে কন্যাকে না দেখে মহাচিন্তাগ্রস্ত হলেন। বাড়ীর সর্বত্র অন্বেষণ করা হলো, কোথাও নেই। আর, তাঁদের ছোট চাকর সেই আশ্রিত যুবকটিকেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তখন সকলেরই সন্দেহ হলো শ্রেষ্ঠীকন্যা নিখোঁজ হবার মূলে রয়েছে একমাত্র তারই চক্রান্ত।

শ্রেষ্ঠী কর্মচারীদের পাঠিয়ে দিলেন নানা দিকে, নানা স্থানে। অশ্বারোহণে তারা ছুটে গেল। শ্রাবস্তীর সর্বত্র অন্বেষণ করল, আনাচে-কানাচে দেখল, কোথাও তাদের সন্ধান পাওয়া গেল না। বৃথা হলো পরিশ্রম। নিষ্ফল মনোরথ হয়ে সকলেই ফিরে এলো। মাতা কান্না জুড়ে দিলেন। কেঁদে কেঁদে তিনি সংজ্ঞাহারা হয়ে গেলেন। শ্রেষ্ঠী দুঃখে, ক্ষোভে, লজ্জায় অপমানে মরমে মরে গেলেন। মর্মন্তুদ দুঃখ ও আতংকে সমভাবেই তিনি আক্রান্ত হলেন। তাঁর মন একেবারে ভেঙ্গে পড়ল, অন্তর যেন শূন্যতার হাহাকারে ভারাক্রান্ত, হৃদয়ের বল হারিয়ে ফেললেন। তিনি শয্যায় আশ্রয় নিলেন। কাঁদতে লাগলেন তিনি, অশ্রুজলে সিক্ত হলো উপাধান। এক একবার আকুল কণ্ঠে বলে ওঠেন– "মা মণি, তুই কোথা গেলি মা, আয়, ফিরে আয়, ফিরে আয় মা। আমার সাধনার ধন, নয়নমণি ফিরে আয়, ফিরে আয়।" আবার ক্ষুব্ধ স্বরে বলে ওঠেন– "অকৃতজ্ঞ-দুষ্ট-দুরাচার, তোকে পথ থেকে কুড়িয়ে এনেছিলাম, আমার অন্নে তোর রক্ত-মাংস, শেষকালে আমাকেই করলি সর্বস্বান্ত, দুধ দিয়ে কালসাপ পোষণ করেছিলাম,

পরিশেষে আমাকেই করছি দংশন। আগুন জ্বেলে দিয়েছিস, অন্তর পুড়ে যাচ্ছে, উঃ, দারুণ জ্বালা। পাষন্ড, তোকে এর প্রতিফল নিশ্চয়ই ভোগ করতে হবে, এ আগুন তোকে দগ্ধ করবে, ভস্ম করবে। কৃতঘ্ন, তোর রক্ষা নেই। উঃ, ভীষণ জ্বালা।"

বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষের লোকেরা হলো দুঃখিত বিস্মিত, স্তম্ভিত। বন্ধ হয়ে গেল বিবাহের সকল উদ্যোগ-আয়োজন। উৎসব মুখর বিবাহ বাড়ী হলো শ্মশানের মতো নিস্তব্ধ-শোকাহত। নগরে, গ্রামে, পথে, ঘাটে সর্বত্র কেবল আলোচনা চলতে লাগল মণির। সকলেই এ বলে নিন্দা করতে লাগল– "দেখো তো কী দুষ্ট মেয়ে। বর ঠিক হয়েছে রাজপুত্রের মতো, বাপ হলো খরচান্ত, বিয়ের দিন পালিয়ে গেল চাকরের সঙ্গে। পথ থেকে কুড়িয়ে এনে মেয়ের সাথে দিলে অবাধ মেলামেশা করতে। হায় রে খেলার সাথী! কুলে কলংক লেপন করে চলে গেল–কুলকলঙ্কিনী হয়ে, ছিঃ ছি! দেখো তো কেমন ভ্রষ্টা দুশ্চরিত্রা মেয়ে! কুলটা পতিতা হলি তো বাপু-অজ্ঞাতকুলশীল অপদার্থের সঙ্গে! কী জঘন্য কথা!"

পতিতা (পটিতা) আচার থেকেই মণি লোক সমাজে 'পটাচারা' নামেই আখ্যায়িত হলো। মণি নাম ঘুচে গিয়ে পটাচারা নামেই সে হলো পরিচিতা।

(৮)

অস্তাচলের অন্তরালে দিনমণি ডুবে গেল। ধূসর অঞ্চল ছড়িয়ে সন্ধ্যারাণী নেমে এলো ধরণীর বুকে। এমন সময় দু'জন অতিথি উপস্থিত হলো জনবিরল এক প্রত্যন্ত গ্রামের এক পুকুরের পাড়ে। অতিথি দু'জনের মধ্যে একজন তরুণ, অপরটি তরুণী। পথশ্রান্ত হলেও যুবক সুদর্শন, সুগঠিত তার অঙ্গসৌষ্ঠব। যুবতী লাবণ্যময়ী, সুদক্ষ শিল্পী বিশ্বকর্মার নির্মিত চারুশিল্প। এরূপ সুন্দর যুবক-যুবতী এদেশে বিরল।

অপরিচিত আগন্তুক দেখে স্থানীয় কয়েকজন লোক সেখানে সমবেত হলো। সকলেই তাদের পরিচয় জানতে চাইল। যুবতী লজ্জায় অধোবদন হলো। যুবক বল্‌ল– আপনারা আমাদের চিনবেন না, বহু দূর দেশ শ্রাবস্তীর আমরা নাগরিক। আমাদের দেশ আপনাদের

অপরিচিত। তাই কি করে পরিচয় দেবো বলুন। যাক্, আজ এক রাত্রি এখানে অবস্থান করতে হবে, তেমন কোনও দয়ালু ব্যক্তি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন কি?"

একজন অবস্থাপন্ন কৃষক উপস্থিত ছিলেন। আগন্তুকদের প্রতি তাঁর দয়া উৎপন্ন হলো। তিনি বললেন– "হ্যাঁ, তোমরা পথশ্রান্ত হয়েছো, আজ রাত্রে আমার গৃহেই বিশ্রাম করতে পার।" এ বলে তিনি আগন্তুকদ্বয়কে সঙ্গে করে গৃহে নিয়ে গেলেন। অতিথিদ্বয় কৃষকের আতিথ্য গ্রহণ করল।

এই অতিথিদ্বয় মণি বা পটাচারা ও যুবকটি। সেই গ্রামে তাদের নিয়ে বহু আলোচনা চলতে লাগল। লোকেরা অনুমান করে নিল– "উভয়েই বড় লোকের ছেলে-মেয়ে হবে, তাদের চেহারা দেখেই বুঝা যায়। মনে হয়, একে অন্যের ভালোবাসায় আবদ্ধ হয়ে পালিয়ে এসেছে। যা হোক্, ভালো হয়েছে, আমাদের গ্রামে একটি পরিবার বেড়ে গেল।"

তারা সে দেশেরই অধিবাসী হলো। একটা স্থান নির্বাচন করে তাদের বসতবাড়ী প্রস্তুত করল। সেখানকার হিতকামীদের সুপরামর্শে যুবক কৃষিকর্ম করবে মনস্থ করল। পটাচারার অলংকার বিক্রি করে যুবকটি গরু-লাঙ্গলাদি কৃষিকর্মের যাবতীয় দ্রব্য সংগ্রহ করল। কাজ আরম্ভ হলো–গ্রামের নিকটবর্তী অরণ্যের পাশে কিছু অনাবাদী জমি আবাদ করল। আবার অবসর সময়ে সে বনে গিয়ে জ্বালানী কাঠও আহরণ করে থাকে।

আর পটাচারা গৃহের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সংগ্রহ করে ঘরকন্না আরম্ভ করল। কলসী ভরে জল আনে, বাটনা বাটে, উদূখলে ধান ভানে, রান্না করে, সেলাই করে। গৃহস্থালীর সকল কাজই সম্পাদন করে। যদিও বা এসব কাজে সে অনভ্যস্ত, তবুও তার উৎসাহ-উদ্যমের অন্ত নেই। তার একান্ত ইচ্ছা-তার প্রত্যেক কাজই সুন্দর হোক, উত্তম হোক। কারণ, তার প্রতিটি কার্যে সন্তুষ্ট করতে হবে তার প্রিয়তমকে। নতুন সংসার পেতে বসা কতো ঝঞ্ঝাট, কতো খাটুনি, তবুও এতে তার কোনোদিন নিরানন্দের আভাস পাওয়া যায়নি। থাকতে হবে তাকে দশজনের মাঝে একজন হয়ে, চলতে হবে সকলের সঙ্গে তাল

মিলিয়ে। তার প্রত্যেক কাজই শৃঙ্খলাপূর্ণ, বাড়ীর সর্বত্র পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন। আসবাব পত্রের সুন্দর সজ্জা ইত্যাদি দেখে প্রতিবেশী নর-নারী সকলেই চমৎকৃত হয় এবং প্রশংসা বাক্যে বলে– "ভদ্র পরিবারের মেয়ে হবে।"

স্বামীর যে সময়ে যা প্রয়োজন, এর যেন কিছুই ত্রুটি না হয়, সেদিকে তার বিশেষ দৃষ্টি। সন্ধ্যায় কর্মক্লান্ত স্বামী ফিরে আসে কর্মস্থান থেকে। এর পূর্বেই পটাচারার সমাপ্ত হয় রন্ধন কার্য। তাড়াতাড়ি এসে স্বামীকে বসবার আসন পেতে দেয়, পাখার শীতল বাতাস দানে প্রিয়তমের শান্তি বিনোদন করে। হাসিমুখে মধুর প্রিয়ালাপে মনে শান্তি দেবার প্রয়াস পায়।

স্বামী বলে– "হাতের পাখাটি আমায় দাও।"

পটাচারা বলে–"কেন?"

"তোমার কষ্ট হচ্ছে।"

"এ কষ্টে আনন্দ আছে, পতিব্রতা নারী স্বামী সেবায় আনন্দ পায়; তা'তে পুণ্যও আছে। নারীকে স্বামীর পরিচর্যা করতে হয় দাসীর মতো, সে পুণ্যে নারী পায় সুগতি। তুমি আমার সুগতির প্রতিবন্ধক হতে চাও?"

"কেন?"

"আমায় যে সেবা করতে দিচ্ছ না।"

"তুমি এতো কথা জান!"

"এটা তো না জানার কথা নয়। মেয়েদের এসব জানা থাকাই উচিত। না জানাটাই সুখ-শান্তির পরিপন্থী। যেহেতু, সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে। যাক্, আর কথা বলে সময় নষ্ট করে লাভ নেই, স্নান সেরে এস। আমি আহারের আয়োজন করছি।

যুবক যখন খেতে বসে, তখন পটাচারা পাখার বাতাস করে এবং এটা-ওটা সুখাদ্য পাতে দিয়ে তৃপ্ত করে। উভয়ের আহার কৃত্য সমাপনান্তে বিবিধ আলাপ কৌতুকে পরস্পর পরস্পরের সন্তোষ বর্ধনের চেষ্টা করে। যুবক চিন্তা করে– "মণি পিতৃগৃহে কতো সুখেই না ছিল। কতো দাস-দাসী তার সেবা করতো, তার খাওয়া-পরা কতো উচ্চস্তরের। শয্যা কতো কোমল ও দুধের মতো ধব্‌ধবে সাদা-সুন্দর,

কোন কাজ-কর্ম তাকে করতে হতো না, অথচ এখানে কতো কষ্টই না সে করছে।" এচিন্তা করে সে পটাচারার প্রতি অত্যধিক করুণা ও সহানুভূতি সম্পন্ন হয়ে সদয় ও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারই করে। কিন্তু, নিজের পরিশ্রমজনিত যে দুঃখ, তা তার অন্তরেই গোপন রাখে। পটাচারার সম্মুখে সর্বদা সে প্রসন্ন বদনেই থাকে, এরূপেই তাদের দিন চলে।

(৯)

মোহ হতেই সংসারের উদ্ভব। মোহের প্রভাবেই অনিত্যে নিত্য, অসত্যে সত্য, দুঃখে সুখ প্রত্যয় হয়। অজ্ঞজনই মোহে মোহিত হয়ে প্রপঞ্চময় আশায় বিষয়-বিষে জর্জরিত হয়। মূঢ়জন বোঝে না—এ সংসার মরু-প্রান্তরের ভীষণ মায়ামরীচিকাসম দুঃখদায়ক। মহা অন্ধ-তাপের সৃষ্টি করে মোহ।

প্রথম সূচনা— পটচারা হয়েছে অন্তঃসত্ত্বা। যে মুহূর্তে সে অনুভব করল তার অন্তর্বর্তী অবস্থা, সে মুহূর্তেই একটা দুর্ভাবনা এসে তার সমগ্র অন্তরকে নিপীড়িত করে তুলল। যত দিন যেতে লাগল, তার দুশ্চিন্তাও তত বেড়ে চলল; মনও হতে লাগল দুর্বল-অশান্ত। সে ভাবে— "গর্ভবতী-নারী ক্রমশঃ উপস্থিত হয় জীবন মরণের সন্ধিক্ষণে। গর্ভভার দুর্বহ। রমণীদের পক্ষে এটাই খুব সংকট মুহূর্ত। এসংকট হতে কে আমায় রক্ষা করবে? কার যত্নে ও পরিচর্যায় আমি নির্বিঘ্ন হবো? সম্মুখে আস্‌ছে আমার মহাবিপদ। এখানে আমার সেরূপ কোন আত্মীয় নেই, যার সাহায্যে অনুকম্পায় আমি নিরাপদ হতে পারি। জগতে মাতা-পিতাই পরম শান্তিময় আশ্রয়। এমন স্নেহ-মমতা, মৈত্রী করুণা আর কারো অন্তরে বিরাজ করতে পারে না। আমি মাতা-পিতার নিকটই যাবো। তাঁদের পায়ে পড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করবো। স্নেহের আধার মাতা-পিতা কি আমায় ক্ষমা করবেন না? নিশ্চয়ই করবেন। আমি যাবো তাঁদেরই আশ্রয়ে, তাঁদেরই শান্তিময় স্নেহের ছায়াতলে।"

সন্ধ্যার সময় যুবক কর্মস্থান থেকে ফিরে এলো। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর স্নান সেরে আহার করল। তারপর উভয়ে সুখালাপে প্রবৃত্ত হলো। সুযোগ পেয়ে পটাচারা মৃদু হেসে বল্‌ল— "তোমায় একটা কথা বলবো।"

যুবক সহাস্যে বল্‌ল– "একটা কেন, এতক্ষণ অনেক কথা তো বলে ফেল্‌লে।"

"এটা কিন্তু, খুব গুরুত্বপূর্ণ!"

যুবক চক্ষু বিস্ফারিত করে বল্‌ল– "গুরুত্বপূর্ণ! তেমন কোনো কথা বলো না কিন্তু, তা'তে আমার ভয় করে। আমার মন এতো লঘু যে, গুরুভার মোটেই সয় না।"

"তোমার হেঁয়ালি রাখ, আমার কথার গুরুত্ব নষ্ট করোনা।"

"আচ্ছা, তা হলে বলো তোমার কি কথা।"

"বল্‌ছি তোমার আশালতা ফলবতী হয়েছে।"

"ফলবতী হয়েছে! বেশ, ফল হলে–সুখ ভোগ করা যাবে।"

"এ'ই আবার হেঁয়ালি।"

"কি বলতে চাও, সোজা বলে ফেল না। 'আশালতা-ফলবতী' এসব আমি বুঝি না।"

"তবে শোন– আমি জীবন-মরণ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি।"

"তাও বুঝলাম না, আরো স্পষ্ট করে বলো।"

"মা-গো, তুমি কেমন পুরুষ, এ কথাটি বোঝ না!"

"তুমি বলতে না জানলে, কি করে বুঝবো?"

"আচ্ছা তা হলে বলি– আমি অন্তঃসত্ত্বা হয়েছি।"

"তা তো আনন্দের কথা।"

"আনন্দ তো করবে, যদি আমি বেঁচে থাকি।"

"বাঁচবে না! কেন?"

"তাই তো বলছি– 'আমার জীবন-মরণ সমস্যার সন্ধিক্ষণ।' কতো নারী যে, এ অবস্থায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে, তা কি তুমি শোনো নি?"

"তুমি যে ঢলে পড়বে, তার নিশ্চয়তা কি?"

"ঢলে যে না পড়বো, তারও বা নিশ্চয়তা কি?"

"যাক্, তোমার মরণের কথা আমার মোটেই ভালো লাগে না। তুমি এখন কি বলতে চাও, বলো।"

"পুরুষেরা মেয়েদের দুঃখ বোঝে না। মেয়েদের এ বিপদই মহাবিপদ। এ বিপদ-ত্রাণের জন্য আমি মা-বাপের কাছে যেতে চাই।

মেয়ের দুঃখ লাঘবের জন্য মা নিশ্চয়ই যত্ন নেবেন। এখানে তো আমার সেরূপ বান্ধব কেউ নেই।"

যুবক বিমর্ষ হয়ে বল্‌ল— "পাগল হয়েছো। কি করে যে এসেছো, সব ভুলে গেছো! সেখানে গেলে কি আর রক্ষা আছে? তুমি তাঁদের মেয়ে, হয়তো তোমায় ক্ষমাও করতে পারেন। কিন্তু, আমাকে যে ক্ষমা করবেন না, একথা অবধারিত। নিশ্চয়ই আমাকে হত্যা করবেন। তুমি কি তাই ইচ্ছা কর?"

"তুমি অমন কথা বলো না, আমার বড়ো দুঃখ হয়। আমার ভালোবাসায় আঘাত পড়ে। তোমার এতো ভয় হলে, আমায় নগরদ্বারে দিয়ে ফিরে আসতে তো পারো। চার-পাঁচ মাস পরেই তো আবার ফিরে আস্‌ছি।"

"তবে তাই হবে।"

"কখন যাবে?"

"একটা ভালো দিন দেখে যাবো আর কি।"

(১০)

পটাচারা এখন পূর্ণগর্ভা। এযাবৎ তার পিতৃগৃহে গমন ঘটে ওঠে নি। কারণ, স্বামীটি কেবল দিন ফেলছে। কাল-পরশু করে সময় একেবারে ঘনিয়ে এসেছে সে পত্নীকে আশ্বাস দিচ্ছে বটে, কিন্তু তার মোটেই ইচ্ছা নয় যে, তার প্রিয়তমা পিত্রালয়ে যাক।

পটাচারা মহা ভাবনায় পড়ল। তার মনে এবার বিরক্তি ধরে গেল। চিন্তা করল— "স্বামী আমায় মিথ্যা বলে ফাঁকি দিচ্ছেন মাত্র। তিনি যাবেন না, এটাই ঠিক। আমাকে কিন্তু যেতেই হবে। তাঁকে না বলেই যেতে হবে। কাল প্রাতে আমি চলে যাবো।" এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলো পটাচারা।

রাত্রি প্রভাত হলো। যুবক কর্মস্থানে চলে গেল। পটাচারা গৃহকর্ম সম্পাদনের পর তাড়াতাড়ি রান্না ঘরে খেয়ে নিল। স্বামীর আহার্য ঢেকে রেখে পিতৃগৃহ অভিমুখে যাত্রা করল। যাবার সময় প্রতিবেশিনী এক রমণীকে বলে গেল।

দুপুরে খাওয়ার সময় যুবক এসে দেখল পটাচারা ঘরে নেই। অন্বেষণ করে দেখল, কোথাও নেই। প্রতিবেশিনীর নিকট জানতে

পারল সঠিক সংবাদ। সে বিশেষ অনুতপ্ত হয়ে চিন্তা করল– "আহা, এ সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যা আজ আমার কারণেই অসহায়া। তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে।" সে খেয়ে দ্রুত গিয়ে অর্ধ পথে তার সাক্ষাৎ পেয়ে বলল– "প্রিয়ে, আমি বারণ করছি, তুমি যেয়ো না।"

"না প্রিয়, আমাকে যেতেই হবে। তুমি বারবার ফাঁকি দিয়ে আমায় গুরুভারাক্রান্ত করেছো। এখন পথ চলতে আমার কী যে কষ্ট হচ্ছে, তা তুমি বুঝবে না।"

"তাই বলছি, তুমি যেও না; অনুরোধ করছি, কাতর বাক্যে বলছি– তুমি যেও না। আমার মন সায় দিচ্ছে না, তোমার কল্যাণ হবে বলে মনে হচ্ছে না, তুমি যেও না।"

"প্রিয়তম, তুমি সেজন্য চিন্তা করো না। মা আমার শান্তিময়ী কল্যাণময়ী। মায়ের কাছে পৌঁছলেই সব শান্তিপূর্ণ ও কল্যাণময় হয়ে যাবে।" এ বলে পটাচারা অগ্রসর হলো স্বামীর কাতর অনুরোধ উপেক্ষা করে। অগত্যা যুবকও তার সঙ্গে সঙ্গে যেতে লাগল। কিছুদূর যাওয়ার পর পটাচারার প্রসব-বেদনা আরম্ভ হলো। যুবককে তা জানাল এবং এক বৃক্ষছায়ায় গিয়ে বসল। অসহ্য বেদনায় অস্থির হয়ে সেখানেই সে শুয়ে পড়ে এপাশ-ওপাশ করতে লাগল। বহু দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে সে প্রসব করল এক পুত্র সন্তান। এ সময় যা কর্তব্য যুবকটি তা সম্পাদন করল। প্রসূতি একটু সুস্থ বোধ করলে, যুবককে বলল–প্রিয় যে উদ্দেশ্য পিত্রালয়ে যাচ্ছিলাম, তা যখন সম্পন্ন হয়ে গেল, এখন আর কেন যাবো। চলো, গৃহে ফিরে যায়।"

যুবক বলল– "বেশ ভালো কথা, চলো।" বলে সে শিশুকে বক্ষে নিল। প্রসূতি খুব ধীরে ধীরে চলল। গৃহে পৌঁছতে তাদের রাত্রি হয়ে গেল। রাত্রে যখন শিশু-সন্তানকে বক্ষে নিয়ে জননী শয়ন করল, তখন পটাচারা পূর্ণমাত্রায় উপলব্ধি করল– সন্তানের প্রতি জননীর কিরূপ স্নেহ-মমতা ও মৈত্রী-করুণা। তখন স্নেহ-করুণার অফুরন্ত ভান্ডার তার জনক-জননীর কথা মনে পড়ল, চিন্তা করল অকুল অন্তরে তাঁদের অমৃতময় মৈত্রী-মমতার কথা। তখন সে পারল না আত্মসম্বরণ করতে,

কেঁদে উঠল ব্যাকুল-অন্তরে। হৃদয় দগ্ধ হতে লাগল তীব্র অনুতাপানলে, মর্মান্তিক দুঃখে হলো জর্জরিত, অভিভূত।

বৎসরাধিক পরের কথা। পটাচারা আবার অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে। এবারও সে মাতা-পিতার নিকট যাবার জন্য আকুল হয়ে উঠল। স্বামীকে বল্‌ল সেকথা। কিন্তু তার পরিবর্তন হয়নি পূর্বমনোভাব। পটাচারা কেঁদে কেঁদে তাকে অনুরোধ করতে লাগল। অগত্যা তাকে নিতে হলো মিথ্যার আশ্রয়। কাল যাবো, পরশু যাবো করে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস অতীত করতে লাগল। এরূপে পটাচারা হলো এখন পূর্ণগর্ভা। আর অপেক্ষা করার সময় নেই। যুবকের অজ্ঞাতে সে ছেলেটিকে কোলে নিয়ে পূর্বের মতোই পিতৃগৃহাভিমুখে যাত্রা করল। সে ক্ষণেই এক কাক বিকট 'কা কা' রব করে তার মস্তকের উপর দিয়ে উড়ে গেল। এটা যে শুভ লক্ষণ নয়, তা চিন্তা করে পটাচারার মনও কেমন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। তবুও সে দুর্মনা হয়েও অগ্রসর হলো।

পূর্ণগর্ভা পটাচারার পক্ষে ছেলে কোলে নিয়ে পথ চলা বড়ো কষ্টকর হয়ে উঠল। কিছুদূর গিয়েই সে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তার মনেও তীব্র বিরক্তির সঞ্চার হলো এবং নিজের প্রতিও ধিক্কার এলো। "আমিই তো এ দুঃখকে বরণ করে নিয়েছিলাম স্বেচ্ছায় ও সানন্দে। তখন তো সবই সুখময় বলে মনে হয়েছিল! মা বাপের মনে দিয়েছি কতো দুঃখ, কতো বেদনা। তাঁরা কি অপমানে জর্জরিত হননি? দগ্ধ হননি অনুতাপানলে? তাদের চিত্ত ক্ষোভ কি অভিশাপে পর্যবসিত হয়নি? সে সঙ্গে আমার জীবনও অতিশপ্ত হয়নি? আমি খুবই অন্যায় করেছি, পাপগ্রস্ত হয়েছি। এর সমুচিত দন্ড নিশ্চয়ই আমাকে ভোগ করতে হবে।"

কর্মশক্তি-মহাশক্তি। স্বর্গ-মর্ত্যের প্রত্যেকেই এ দুর্জয় শক্তির করায়ত্ত। যে মেয়ে কুলটা হয়ে আদিগুরু, মহাগুরু, ব্রহ্মা সদৃশ মাতা পিতার অন্তরে অশান্তির তীব্র অনল জ্বেলে দেয়-তাকেই ভোগ করতে হয় অসহ দুঃখ, সারাজীবন অনুতাপে দগ্ধ হতে হয় তিলে তিলে। পটাচারার দুষ্কর্মের নিষ্ঠুর বিপাক যবনিকার অন্তরাল থেকে নির্মম পরিহাসে তাকে বলে দিচ্ছে– "হে দুর্বিনীতা- কুলকলঙ্কিনী নারী, তোর ললাটে লেখা রয়েছে এর চেয়েও ভীষণতর দুঃখ। সমাগত হচ্ছে যে মর্মদাহী-নিদারুণ দুঃখ। দুঃসহ দুঃখানলে হতে হবে দগ্ধীভূত। কর্মের

তাড়নে হতে হবে নির্যাতিত। রক্ষা নেই, ত্রাণ পাবার উপায় তোর নেই।"

(১১)

যুবক দ্রুত অনুধাবন করে অর্ধপথে পটাচারার সঙ্গে একত্র হলো। এবার কিন্তু সে বারণ করল না, সেও সঙ্গে সঙ্গে যেতে লাগল। শিশু পুত্রকে সে কোলে নিল। পটাচারা অত্যধিক ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তবুও ধীরে-ধীরে পথ অতিক্রম করতে লাগল। ক্রমশঃ এসে অরণ্য পথ সম্প্রাপ্ত হলো। অতি কষ্টে চলতে লাগল পটাচারা কলঙ্কময় বন্ধুর পথে। কিছুদূর গমনের পর অকাল মেঘ উঠল। ঘোর কালোমেঘে আকাশ আচ্ছন্ন হলো। প্রবল শীতলবায়ু প্রবাহিত হতে লাগলো। পুনঃপুনঃ বিদ্যুৎ স্ফুরণে গগনমাত্র প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। মুহুর্মুহুঃ প্রলয়ঙ্কর বজ্রনির্ঘোষ কর্ণ বধির করে তুলল, দেহ বারবার চমকে উঠল, প্রাণে মহা আতঙ্কের সৃষ্টি করল। সে সঙ্গে আরম্ভ হলো মুষলধারে বৃষ্টিপাত।

এমন সময়ে পটাচারারও আরম্ভ হলো প্রসব-বেদনা। উঃ, দুঃখ! আশ্রয় নেই। অগত্যা এক বৃক্ষমূলে বসে পড়ল। বৃষ্টির জলে সবাই সিক্ত হতে লাগল, প্রবল শীতে সবাই কম্পমান, আতংকেও সন্ত্রস্ত। শিশুটি কাঁদতে লাগল চিৎকার করে। তখন যে পটাচারার কিরূপ সংকট মুহূর্ত, কী যে দারুণ দুঃখ-যন্ত্রণাময় দুঃসময়, তা বর্ণনাতীত।

তীব্র প্রসব-বেদনায় তরুণীর তন্বী দেহলতা লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। সে কাতর কণ্ঠে বলে উঠল– "প্রিয়তম, রক্ষা কর, রক্ষা কর শিশুকে। উঃ, অসহ্য যন্ত্রণা! আমি আর বাঁচবো না। না বাঁচি ক্ষতি নেই; কিন্তু, প্রাণেশ্বর, যে আসছে-সুকোমল শিশু সন্তান, তাকে রক্ষা করো, বৃষ্টি থেকে রক্ষা কর। প্রিয়তম, যাও, শীগ্‌গির যাও, লতা-পাতা যা পাও নিয়ে এসো। উঃ, তীব্র বেদনা, আর সহ্য হচ্ছে না। যাও, তাড়াতাড়ি গিয়ে নিয়ে এসো।"

যুবক দ্রুত গমন করল। দ্রুতহস্তে লতা-পাতা সংগ্রহ করতে করতে সে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। পটাচারা অস্ফুট কাতর শব্দে পাশ পরিবর্তন করতে লাগল। বলতে লাগল কাতর ক্রন্দনে– "মাগো, মা জননী, এসংকট থেকে ত্রাণ পেতে যাচ্ছিলাম তোমার আশ্রয়ে, এ পোড়া-অদৃষ্টে তা ঘটলো না। দেখে যাও মা, একটিবার দেখে যাও,

স্নেহময়ী মা আমার, তোমার আদরের মণি কী দারুণ সংকটে পড়েছে। মাগো-বাবাগো তোমাদের পায়ে আমার এ ভিক্ষা আমায় ক্ষমা কর। মাগো, উঃ যন্ত্রণা! ওগো মা, মা!" বলে কাতরোক্তি করতে করতে সে প্রসব করল– এক সুন্দর পুত্র সন্তান।

"আহা দুঃখ, ইনি গেলেন কোথা! এতক্ষণ হলো এখনো তাঁর দেখা নেই কেন? স্বামীন্ শীগ্‌গির এসো শিশুকে রক্ষা কর। কই এলে না?" বল্‌ল প্রসূতি কাতর কণ্ঠে।

দিবা অবসান হলো। সন্ধ্যা নেমে এলো। বৃষ্টি থেমে গেছে। আকাশ কিন্তু মেঘাচ্ছন্ন। দেখতে দেখতে ধরা অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। যে দিকে চায়, সে দিকে আঁধার। এ অন্ধকার ঘেরা অরণ্যে প্রসূতি পটাচারার উপায় কি? এ বিপদে তাকে কে রক্ষা করবে? একটু আশ্বাস দেবারও তো কেউ নেই! যে একজন ছিল সেও তো কোথায় অন্তর্ধান করল! শিশু দু'টিও সচিৎকারে কাঁদতে লাগল সমতালে। জননী তাদের শান্ত করবে কোন্ উপায়ে? প্রবল শীতে কাঁপছে প্রসূতি, কাঁপছে শিশু দু'টি। মাটি সিক্ত, দেহ সিক্ত, কাপড় সিক্ত, সবকিছুই সিক্ত। কি করবে দুর্ভাগিনী জননী? কিরূপে সন্তানদ্বয়কে রক্ষা করবে? একটু উষ্ণতার বিধান করবে, দুর্বিষহ দুঃখে মায়ের হৃদয় যেন ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। সে করল কি, তার বুকের ধন দু'টিকে রাখল বুকের নীচে; হাতের কনুই ও জানুর উপর ভার রাখল আপন দেহের।

শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্য, ক্ষণে ক্ষণে বিপদের আশংকায় অবলা সন্ত্রস্ত। বৃক্ষপত্র থেকে জল পড়ার শব্দেও সে শিউরে উঠে। দুঃখের বিনিদ্ররজনী শেষ হতে চায় না। কতো চিন্তা, কতো অশান্তি, কতো অনুতাপ তার অন্তরকে করছে নিপীড়িত-নিষ্পেষিত। আহা, অভাগিনী পটাচারার এ কেমন দুঃখ।

সে ভাবে– "আমার এ অভিশপ্ত জীবনে সুখের মুখ দেখবো কি? যাকে ভালোবেসে, যার আশায় কুলত্যাগিনী হয়ে এতো দুঃখ ভোগ করছি, সে এখন কোথায় গেল? সে কি বিপদগ্রস্ত হলো? ভগবান, আমার প্রিয়তমের যেন কোন বিপদ না ঘটে। আমার মন কেন এরূপ করছে! স্বামীর বিপদ আশংকায় প্রাণে হাহাকার জাগলো কেন? হা অদৃষ্ট, না জানি আমার কপালে কি আছে? উঃ, আর যে চিন্তা করতে

পারছি না। আমার বুক যেন চুরমার হয়ে যাচ্ছে। স্বামিন্, প্রাণেশ্বর, আমার পরমায়ু সব তোমায় দিচ্ছি, তুমি আরো দীর্ঘদিন বেঁচে থাকো। উঃ, কি কু'ক্ষণে আমি জন্মেছিলাম জানি না। আমার স্নেহ মন্দাকিনী মাতা, করুণা-নির্ঝর, পিতা ও রক্তের সম্বন্ধ জ্ঞাতিদের মুখে কালি দিয়ে কুলকলঙ্কিনী হয়ে কুলত্যাগ করেছিলাম। তাঁদের মর্মান্তিক দুঃখদানের এই তো সমুচিত প্রতিফল! মোহই আমায় মতিভ্রম করে দিয়েছিল। উঃ, দুর্দান্ত মোহ, তুই-ই করলি আমার সর্বনাশ। চরম দুঃখময় দুর্দিন সৃষ্টি করলি তুই। তোর এ কেমন প্রভাব! আহা, আমার এ লাঞ্ছিত ঘৃণ্য জীবনের এহেন দুঃখ বারতা শুনে তরুণী কুমারীগণ সাবধান হবে কি? ওগো কুমারীগণ, এহেন দারুণ দুঃখপূর্ণ মোহ-পাশে জীবনে কখনও পা দিও না, এটা আমার একান্ত অনুরোধ। আমি ভুক্তভোগিনী হয়ে তোমাদের সাবধান করছি।"

ঐদিকে পটাচারার স্বামী যুবকটি প্রবল বারিধারা মাথায় নিয়ে দ্রুত গিয়ে নানাস্থানে থেকে লতা-পত্র সংগ্রহ করছিল। দেখল, এক বল্মীকের উপর লতাঝাড় ও বড় বড় পত্র। দেখেই সেগুলি সংগ্রহে ব্যস্ত হলো। সেখানে ছিল এক কালান্তক সর্প, ঘোর বিষধর। লতা যেই আকর্ষণ করল, অমনি ক্রূর সর্প ক্ষুব্ধ হয়ে তাকে করল দংশন। দংশন করা মাত্রই অগ্নিজ্বালার মতো দেহে দারুণ জ্বালার সৃষ্টি হলো। চোখে সে অন্ধকার দেখল। আর্তকণ্ঠে বলে উঠল— "উহুঃ, জ্বলে গেলাম, জ্বলে গেলাম; চোখে তো কিছুই দেখছি না; পারলাম না, পারলাম না প্রিয়ে, তোমাদের রক্ষা করতে; উঃ, জ্বালা জ্বালা, দারুণ জ্বালা" বলতে বলতে সে মাটিতে ঢলে পড়ল। তার সর্বাঙ্গ হয়ে গেল— ঘোর নীলবর্ণ। সেখানে সে মুহূর্তেই তার মৃত্যু হলো।

কালরাত্রির অবসান ঘটল। প্রভাত হলো। ধীরে ধীরে তরুণ-তপন তার সোনালী কিরণ অরণ্যের সর্বত্র ছড়িয়ে দিল। মার্তাণ্ডের প্রবল প্রতাপ অশুভ রজনীর বিভীষিকাকে বিদূরিত করে দিল। আকাশ নির্মল। মনোরম সাজে সজ্জিত হয়েছে প্রকৃতি। বিহঙ্গকূল প্রফুল্ল মনে রব করছে। দু'একটা কোকিল মধুর স্বরে প্রকৃতির সৌম্যভাব ঘোষণা করছে।

প্রকৃতির মোহন-দৃশ্য পটাচারার অন্তরে কিন্তু প্রভাব বিস্তার করতে পারল না। তার চিত্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, শঙ্কাকুল ও ভীতিব্যাকুল। সে ধীরে ধীরে বসল। দেহ হিমশীতল ও রক্তশূন্য, বড়ো দুর্বল, মুখমন্ডল বিশুষ্ক-পাংশুবর্ণ, চক্ষু কোটরাগত। তার অন্তরে কে যেন বলে দিচ্ছে– "পটাচারা, তোর দুঃখ এখনও শেষ হয়নি। আরো রয়েছে–যা এর চেয়েও ভীষণতর, দারুণতর শোক-দুঃখ সমাকুল।

তাতে তোকে হতে হবে-নিপীড়িত, মর্মাহত, অভিভূত।"

"স্বামীকে খুঁজে দেখতে হবে, অবস্থা বুঝতে হবে" পটাচারা এ করে দুর্বল হাতে ধীরে-সযত্নে বক্ষে তুলে নিল তার বক্ষের ধন নবজাত শিশুটি। স্নেহাতিশয্যে শিশুর মুখে-ললাটে অঙ্কিত করলো স্নেহচুম্বন। একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করে সে ধীরে উঠে দাঁড়াল। বড় শিশুটির হাত ধরে বলল– "এসো বাবা, তোমার পিতা কোথায় গেল দেখি।"

পটাচারা ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে বনপথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলো। তার হৃদয়-বল্লভ যে পথে গিয়েছিল, সে পথ ধরেই সে যেতে লাগল। কিছুদূর গিয়ে বল্মীকের কাছে থম্‌কে দাঁড়াল। মুখ দিয়ে বের হয়ে পড়ল একটা মর্মন্তুদ অস্ফুট কাতর ধ্বনি। মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করে উঠল, থরথর কাঁপতে লাগল সর্বাঙ্গে, চোখে অন্ধকার দেখল, বক্ষ বিদীর্ণ হবার উপক্রম হলো, হৃৎপিণ্ড যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে– এরূপ অনুভূত হলো। তখন সে আর্তকণ্ঠে কেঁদে উঠে স্বামীর প্রাণশূন্য দেহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কেঁদে কেঁদে সে বলতে লাগল– "স্বামী, প্রিয়তম, একটি-বার চোখ খোল, চেয়ে দেখো তোমার আশা-আকাঙ্খার স্নেহের দুলাল নবজাত শিশুকে। যার আবির্ভাবের কথা শুনে তুমি আনন্দিত হয়েছিলে, তাকে একটিবার দেখো। প্রাণেশ্বর, আমায় না বলে কোথায় লুকালে? কার হাতে আমায় সঁপে দিয়ে গেলে? শিশুদের কি গতি হবে? কাকে তারা বাবা ডাকবে? প্রাণনাথ, অভাগিনীর জন্য কতো যে দুঃখ পেলে। আমাদের রক্ষা করতে গিয়ে তুমি প্রাণ হারালে। আহা, সাপের দংশন, কী দারুণ জ্বালা! কী ভীষণ যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে তোমার প্রাণ বায়ু বের হয়ে গেছে। আহা, হৃদয়-রতন, তুমি চলে গেলে, চিরতরে? আমি আর চিন্তা করতে পারছি না। উঃ, এতো দুঃখ আমার কপালে ছিল! হায়,

হায়, অভাগিনীর একি হলো।" বলে কপালে করাঘাত করতে লাগল, কাতর কণ্ঠে বিলাপ আরম্ভ করল–

"হায় হায়! একি হল সর্পবিষে মৃত্যু হল
অরণ্যেতে হয়ে অসহায়।
অভাগীর প্রাণনিধি হরি কেন নিলেবিধি,
অনাথিনী করিয়া আমায়।
শিরে মম বজ্র হানি কেন গেলে প্রাণমণি
শোকশেল হৃদয়ে বিঁধিয়া,
ওগো মম প্রাণপতি কি হবে আমার গতি
কোথা গেলে মোরে ফাঁকি দিয়া।
শিশু তব প্রাণধনে না দেখিলে দুনয়নে
এই দুঃখ ভুলিব কেমনে?
চোখ খোল প্রাণপতি করিতেছি এ মিনতি
দেখ তব হৃদয়- রতনে।"

এরূপ হৃদয় বিদারক বিলাপ করতে করতে বন থেকে কয়েকটা ফুল চয়ন করল। প্রাণপতির দেহের উপর রেখে পূজা করল, প্রণাম করল। তারপর বিলাপের সুরে বিদায় নিল–চির বিদায়।

"ওগো! বাল্যবন্ধু প্রাণসখা তোমাকে রাখিয়া একা
চলে যেতে হৃদয় বিদরে,
ক্ষম ওগো মোরে তুমি বহু দোষে দোষী আমি
নিবেদন করি সকাতরে।
ছোটকালে যবে মম মাত্র পঞ্চ বয়ঃক্রম
প্রীতিপাশে বাঁধিলে আমায়,
আবাল্য বান্ধব তুমি কিরূপে ভুলিব আমি
ওগো স্বামী প্রণমি তোমায়।
প্রাণ কাঁদে অশ্রু ঝরে শোকানলে দগ্ধ করে
হৃদে মম পাষাণ বাঁধিয়া,
বিদায় নিতেছি প্রভু, দেখা নাহি হবে কভু
বনমাঝে তোমাকে রাখিয়া।"

এরূপ বিলাপ করতে করতে পটাচারা শিশুদ্বয়কে সঙ্গে নিয়ে ধীরে ধীরে পিত্রালয় অভিমুখে চল্‌ল। সে এতো দুর্বল, এতো কাতর হয়ে পড়ল যে, তার দেহ কাঁপতে লাগল, মাথা ঘুরতে লাগল, অবশ হয়ে এলো পদদ্বয়। দুঃখের উপর দুঃখ, অনাহার-অনিদ্রা, আর কতো সহ্য হয় অবলা প্রসূতি নারীর। তবুও চলতে লাগল। কিছুদূর চলার পর সম্মুখে পড়ল বিস্তীর্ণা অচিরাবতী নদী। পূর্বদিনের প্রবল বৃষ্টির দরুণ নদীতে জল হয়েছে এক বুক পরিমাণ, স্রোত হয়েছে প্রখর।

পটাচারার সাহস হলো না– শিশুদ্বয়কে একসঙ্গে নিয়ে নদী পার হতে। বড় ছেলেকে বল্‌ল– "বাবা, এখন তুমি এখানে বসে থাকো, তোমার ছোট ভাইকে ওপারে রেখে আসি, পরে তোমায় নিয়ে যাবো।" এ বলে শিশুকে মস্তকের উপর তুলে ধরে অতি কষ্টে সে নদী পার হতে লাগল। খরস্রোত তাকে টেনে নিয়ে যেতে চায়। তার দুর্বল শরীরে যতটুকু শক্তি আছে, তা দিয়ে সংগ্রাম করতে লাগল স্রোতগতির বিরুদ্ধে। অতিকষ্টে উত্তীর্ণ হলো পরতীরে। কতেক বৃক্ষপত্র সংগ্রহ করে তদুপরি শিশুকে শুইয়ে রেখে আবার সে নদীতে নেমে পড়ল। নদীর মধ্যস্থলে যখন সে পৌঁছল, তখন দেখে যে-এক শ্যেনপক্ষী শ্যেন নজরে নিরীক্ষণ করছে তার নয়নমণিকে। রক্তিমবরণ শিশুটিকে মাংসখন্ড মনে করে শ্যেনপক্ষী তৎক্ষণাৎ ছোঁ মেরে তাকে নিয়ে চল্‌ল উর্ধ আকাশের নীলপথে।

জননী দিশেহারা হয়ে ব্যাকুল কণ্ঠে চীৎকার করে শব্দ করল– "হো-হো, হোয়া-হোয়া হায়-হায়।" তার এ শব্দ পৌঁছল না শ্যেনের কর্ণে। গগনপথে নিয়ে চল্‌ল শ্যেন অভাগিনীর দুঃখে লব্ধ বক্ষনিধিকে তীক্ষ্ম নখশল্যে বিদ্ধ করে, শিশুর করুণ ক্রন্দন-ধ্বনি শোনা যাচ্ছে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর।

হতবুদ্ধি ও মূহ্যমান হয়ে পটাচারা অপর তীরের ছেলেটির প্রতি চোখ ফিরাতেই দেখতে পেল–ছেলেটি নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। কারণ হলো– মাতাকে উর্ধ হস্তে 'হায় হায়' চীৎকার করতে শুনে সে মনে করল– 'মা তাকে ডাকছে'। তখন সে দ্রুত এসে নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আর কি রক্ষা আছে? জলরাশি তাকে সাদরে গ্রহণ

করল। শিশু নিমগ্ন হলো নদীর জলে। স্রোতাস্বিনীর স্রোত তাকে দ্রুত নিয়ে চল্‌ল সোল্লাসে।

সবশেষ! কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পটাচারা দাঁড়িয়ে রইল সেখানে নদীর মধ্যস্থলে। সে হয়ে গেছে সংজ্ঞাহারার মতো। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হায় হায় করুণ স্বরে কেঁদে কেঁদে কম্পিত কলেবরে ধীরে ধীরে এসে তীরে উঠল। যেখানে তার নবজাত শিশুটি রেখেছিল, সেখানে এলো। শোকাবেগ সংবরণে অসমর্থ হয়ে সেখানেই সে লুটিয়ে পড়ল। তার শরীর ও মন এতো দুর্বল হয়ে পড়েছে যে, রোদন করার শক্তিও সে হারিয়ে ফেলেছে, চোখের জলও শুকিয়ে গেছে। বুদ্ধি-বিবেচনাও লোপ পেয়েছে। বক্ষ যেন চুরমার হয়ে যাচ্ছে, হৃৎপিণ্ডে যেন বিদীর্ণ হচ্ছে। দুঃখের উপর দুঃখ, আর কত সহা যায়। শোক, দুঃখ ও বিয়োগ যন্ত্রণা তার সহ্যের সীমা অতিক্রম করল। কখন যে সে সংজ্ঞাহারা হয়ে মাটিতে ঢলে পড়েছে, সেও জানে না। প্রখর রৌদ্র, উর্ধে অসীম নভোমন্ডল, নিম্নে বিশাল ধরিত্রী, পার্শ্বে তরতর বাহিনী অচিরাবতী।

জগত আত্যন্তিক দুঃখপূর্ণ–এটা চিরসত্য। কেবল অচ্ছেদ্য দুঃখের মধ্য দিয়েই চলছে জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ। জীব-জীবনে সুখের পরিকল্পনা-ঐন্দ্রজালিকের মায়া-উদ্যানের মতো। দারুণ দুঃখের অঝোর ধারাবর্ষী রজনীর ঘনান্ধকারে বিদ্যুৎ চমকের মতো মিথ্যা সুখের আলোকে যে বিহ্বল হয়ে পড়ে সে নিশ্চয়ই বাতুল।

মহাদুঃখে জর্জরিত মানব জীবন,
অবিদ্যা কারণে হয় দুঃখের সৃজন।
জন্ম-দুঃখ, ব্যাধি-দুঃখ, দুঃখ শৈশবের,
মহাদুঃখ যৌবনের, দুঃখ বার্ধক্যের ।
অপূর্ব বাসনা আর প্রিয়ের বিয়োগ,
নিদারুন দুঃখময় অপ্রিয় সংযোগ।
জরা-মরণের দুঃখ বড় ভয়াবহ,
অনির্বাণ চলে এই দুঃখের প্রবাহ।

(১২)

পটাচারা আজ বড়ো দুঃখিনী, অনাথিনী। কী না ছিল তার! কোন্ দুঃখে সে বিসর্জন দিল সর্বস্ব, ত্যাগ করল কুল, মাতা-পিতা আত্মীয়-স্বজন? কিসের তাড়নায় বরণ করে নিল মহাদুঃখকে? আজ কেন সে সর্বহারা, দিশাহারা, সংজ্ঞাহারা হয়ে পড়ে রয়েছে মৃত্তিকা শয্যায়? আহা, কী যে দারুণ দুঃখ এ দুঃখিনী নারীর! এ দুঃখের অবসান ঘটবে কখন? না-কি এর চেয়েও ভীষণতর দুঃখ রয়েছে ওর অদৃষ্টে!

দিবাকর পশ্চিম আকাশের শেষপ্রান্তে নেমে পড়েছে। শীতল বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে। তারই স্পর্শে পটাচারার সংজ্ঞা ধীরে ধীরে ফিরে আসতে লাগল। তার শরীর ও পরিহিত বস্ত্র ধর্মসিক্ত। অনুভব করল সে অত্যধিক দুর্বলতা-অবশতা। এতক্ষণ যাবৎ সে কোন্ অচিন দেশে গিয়েছিল তার প্রাণপতি ও হৃদয়রত্ন শিশুদ্বয়ের সন্ধানে, তা সে বুঝে উঠতে পারছে না। সে সংজ্ঞা লাভ করল বটে, কিন্তু এখনও প্রকৃতিস্থ হতে পারেনি। সে বুঝতে পারছে না, তার যে কি অবস্থা হয়েছে। মৃত্তিকা শয্যায় শায়িত কেন, সে তা চিন্তা করতে লাগল।

ক্রমশঃ মনে পড়ল তার জীবনের সমস্ত ঘটনা। এবার কেঁদে উঠল ডুকরে। দুর্বল-কাতর কণ্ঠে বলে উঠল— "হায় হায়, পতি মরল পথে, দু'টি পুত্রের একটি নিল শ্যেনপক্ষী, আর একটি মরল নদীর জলে ডুবে। আমি হলাম সর্বহারা, দিশাহারা। আমার জীবন অভিশপ্ত। মা-বাপের অন্তরে দিয়েছি বড়ো জ্বালা। আমি পাচ্ছি তার শতগুণ অধিক যন্ত্রণা। উঃ, বুক ফেটে যাচ্ছে। দুর্ভাগিনীর মরণও নেই। এখন যাবো, মা-বাপের পায়ে পড়ে ক্ষমা ভিক্ষা চাইবো। আহা, তাঁদের অন্তরে কতো স্নেহ, কতো মমতা।" এরূপ সে অনেক কথা চিন্তা করল। সে মাথার মধ্যে কেমন এক যন্ত্রণা অনুভব করতে লাগল। কখনো কাঁদে, কখনো বিলাপ করে, কখনো নীরব থাকে। চোখে কিন্তু জল নেই। তার শোকাবেগ যখন উচ্ছল হয়ে পড়ে, তখন আরম্ভ করে বিলাপ। সে বিলাপ কত করুণ, কত মর্মান্তিক—

পতি-পুত্র তিনজন দুঃখিনীর প্রাণধন
করে গেল মোরে অনাথিনী,
ওরে মম বাছাধন দেখা দিয়ে কিছুক্ষণ

কোথা গেলি নয়নের মণি।
আমি বড় অভাগিনী চির দুঃখী মা জননী
এত দুঃখ সহিব কেমনে,
হায় হায় একি দুঃখ! দুঃখিনীর নাহি সুখ
এত দুঃখ পাই কি কারণে!
বড় আশা ছিল মনে নিয়ে পতি-পুত্রধনে
সংসার পাতি মন-সুখে,
হায় হায়! একি হল ভরা নৌকা ডুবে গেল
শোকানল জ্বলে মম বুকে।
ওগো পতি, কত করে নিবারিলে বারে বারে
না শুনিয়া তোমার বচন,
কর্মদোষে অবশেষে নিদারুণ দুঃখ এসে
শোকতাপে করিছে পীড়ন
আমি অভাগিনী নারী এ শোক সহিতে নারি
শোকানলে বড় যে ভীষণ,
দুই পুত্র, প্রিয়পতি, দিলে মোরে দুঃখ অতি
সারাক্ষণ দহিতেছে মন।

নিজকে ধিক্কার দিয়ে বলছে–

ওরে তুই পটাচারা স্বামী-পুত্র সর্বহারা
অভিশপ্ত তোর এ জীবন,
তুই বড় পাতকিনী লজ্জাহীনা কলঙ্কিনী
পাপ তোর নিশ্চয় ভীষণ।
মাতা- পিতা গুরুজনে দিয়েছিস্ দুঃখ মনে
মোহবশে প্রণয়ে মাতিয়া,
দুষ্কর্মের প্রতিফল অনুতাপে অবিরল
দহিতেছে দুঃখিনীর হিয়া।
কে আমায় শান্তি দেবে অশ্রুবারি মুছে নেবে
দুঃখহারী কে আছে ধরায়,
মাতা-পিতা আদিগুরু স্নেহনিধি কল্পতরু
দিবে তারা সান্ত্বনা আমায়।

(১৩)

শোকাকুলা পটাচারা ধীরে ধীরে গিয়ে উপনীত হলো পিতৃভবনের কিছুদূরে। পথে স্বগ্রামের এক ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হলো। তাকে কাতর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল– "হ্যা গো, তুমি আমার মা-বাপের খবর জান? তাঁরা কেমন আছেন জান?"

লোকটা বিস্ময় দৃষ্টিতে চেয়ে বল্‌ল– "তোমার মা-বাপ কে হন?"

"জান না? এ দেশে যিনি ধনবান-শ্রেষ্ঠী নামে পরিচিত, রাজপথের ধারে যাঁর প্রকান্ড বাড়ী, তাঁর যে ছিল এক মেয়ে আদরের দুলালী মণি।"

"তুমি মণি না-কি?"

"হ্যাঁ গো, হ্যাঁ।"

"তাঁদের খবর না শুনলেই ভাল হতো।"

"কেন, অমন করে বলছো কেন?"

"তাঁদের কথা শুনে সুখী হতে পারবে না।"

"তবুও বলো, তোমার পায়ে পড়ি, তাঁরা কেমন আছেন বলো।"

"গতকাল যে দুর্যোগ হয়ে গেল, তা জান?"

"জানি না? খুব ভালো করেই জানি। সে ভীষণ দুর্যোগের দুঃসহ দুঃখ যে, আমিও সম্পূর্ণ ভোগ করেছি, শুনবে? না-না, আগে বলো আমার মা-বাপের সংবাদ।"

গতকাল যে খুব প্রবল ঝড়-বৃষ্টি হয়ে গেছে, তখন এক দারুণ বজ্রপাত হয়েছিল। এসব দুর্যোগে তোমার বাবার প্রাসাদটা ধ্বসে পড়ল দেওয়াল চাপা পড়ে মারা গেল তোমার বাবা, মা, ভাই এ তিনজনই। তিনজনকেই এক চিতায় সৎকার করা হচ্ছে; ওই দেখো চিতার ধূম।"

"এ্যাঁ, কি শোনালে? তিনজনই মরেছে?"

"হ্যাঁ, তিনজনই মরেছে।" লোকটা চলে গেল।

তখন পটাচারার কি অবস্থা হলো? তার মস্তকেও যেন একটা বজ্রপাত হলো। চোখ অন্ধকার হয়ে মাথা ঘুরে সে পড়ে গেল। সে যেন এ পৃথিবীতে নেই। ভূমন্ডল যেন ঘুরছে- কুলালচক্রের মতো। স্মৃতি-বিভ্রম ঘটল তার। সে উন্মাদিনী হয়ে গেল। অট্টহাস্য করে উঠে দাঁড়ালো। একবার এদিক-ওদিক বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে পিতৃভবন

অভিমুখে ছুটল। সে কখনো কাঁদে, কখনো হাসে, কখনো বিলাপ করে, কখনো গান করে, কখনো প্রলাপ বকে, কখনো থম্‌কে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকায় বিহ্বল দৃষ্টিতে। ছেলের দল তার পিছু নিল।

উন্মাদিনী এবার পিতৃভবনের প্রাঙ্গণে এসে থম্‌কে দাঁড়ালো। বিহ্বল-দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক দেখতে লাগল। জন-মানবশূন্য ভগ্ন-প্রাসাদের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল বিলোল-কটাক্ষে অথচ ভাব-গম্ভীর দৃষ্টিতে। কি যেন স্মৃতিপথে জাগ্রত করবার চেষ্টা করছে। কি যেন তার মনে পড়েছে। তখন দৃষ্টি হলো তার করুণ ও দুঃখ মিশ্রিত, বিমর্ষ হয়ে গেল মুখমন্ডল, জ্বলে উঠল শোকানল, গুম্‌রে সে কেঁদে উঠল।

ক্ষণকাল সে নীরব থেকে এদিক-ওদিক দেখতে লাগল। তারপর বিড়-বিড় করে কি বলতে লাগল। ক্রমশঃ শব্দ স্পষ্ট হলো। বললো সে কেঁদে কেঁদে– "মা-মা, বা-বা, ভাই-ভাই। ঘর ভেঙ্গেছে, বা-বা মরেছে মা মরেছে,

আর
ভাই ম-রে-ছে,
স-ব গিয়েছে,
হয়েছে ছার-খার,
হয়েছে ছারখার।

একটা অট্টহাস্য করে উন্মাদিনী সেখান থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেল। ছেলের দল 'হৈ-চৈ' "পাগলী পাগলী" বলে তার পিছু নিল।

পাগলিনী পটাচার কখন যে কোথায় যায় ঠিক নেই। সে এখন বস্ত্রহীনা। তার বসন কখন কোথা খসে পড়েছে সে খবর সে রাখে না; প্রয়োজনও মনে করে না। কথা বলে সে অপ্রয়োজনে, হাসে অকারণে, রোদন করে, বিলাপ করে, যত্র-তত্র ঘুরে বেড়ায়। বালকেরা তার পেছনে হৈ-চৈ করে, ধূলি মারে, ঢিল ছুঁড়ে। আহা, ধনীর দুলালীর এ-কি দুর্দশা! এ-কি দুর্ভোগ!

তার কর্মের এ-কি নিমর্ম পরিহাস!

(১৪)

শ্রাবস্তীর জেতবন বিহার। ভগবান গৌতম বুদ্ধ ধর্মদেশনা করছেন। মহাপরিষদে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক-উপাসিকা, ধনী-দরিদ্র, পন্ডিত-

মূর্খ, আপামর সর্বসাধারণ সমবেত হয়েছেন। তথাগতের কম্বুকণ্ঠ মুখর হয়ে উঠল নৈর্বাণিক ধর্ম বিশ্লেষণে। শ্রোতৃবৃন্দ অনন্যমনে শুনছেন অমিয়-মধুর ধর্মোপদেশ। সকলেই ভাবাবেশে তন্ময়। সভা নীরব-নিথর। কেবল ধ্বনিত হচ্ছে সুগতের পীযুষবর্ষিনী বাণী। এ সময় পটাচারা যাচ্ছিল আপন খেয়ালে বিহারের সম্মুখবর্তী রাজপথ দিয়ে। মহাকারুণিকের করুণাদৃষ্টি পড়ল তার প্রতি। সুগত তাকে লক্ষ্য করে এমন এক অপূর্ব শক্তি প্রয়োগ করলেন—যার প্রভাব তাকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করতে লাগল সভাভিমুখে। তখনি সে দাঁড়াল স্তব্ধ হয়ে। ফিরল বিহারের দিকে। ধীরে ধীরে অগ্রসর হলো। তার অনিমেষ দৃষ্টি বিন্যস্ত করল শাস্তার প্রতি। গুঞ্জন উঠল মহাপরিষদে। প্রধানেরা বলে উঠল— "বাধা দাও পাগলিনীকে। এদিকে আসতে দিও না, তাড়িয়ে দাও।"

"বারণ করো না, আসুক পাগলিনী" সম্বুদ্ধের গম্ভীর কণ্ঠ ধ্বনিত হলো। সকলে নিরস্ত হলো। শাস্তা বললেন,– "ভগ্নি, পূর্বস্মৃতি লাভ করো।" একথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই স্মৃতি লাভ করল সে। পূর্বের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলো। উন্মত্ততার নিরসন হলো। তখনি তার উলঙ্গাবস্থা জানতে পারলে সে। অসীম লজ্জায় সে বসে পড়ল। সভা থেকে এক ভদ্রলোক নিজের গায়ের চাদর তার প্রতি নিক্ষেপ করলেন, সে তা পরিধান করল তাড়াতাড়ি। তারপর সে ধীরে ধীরে উপনীত হলো সুগতের নিকট, বন্দনা করল পঞ্চাঙ্গ লুটিয়ে। বল্‌ল বিনীত বাক্যে— "প্রভু, আমায় আশ্রয় দিন। আমি আপনার শরণাপন্ন হচ্ছি, আপনি আমার প্রতিষ্ঠা হোন্। ভগবন্, পথে স্বামীর মৃত্যু হয়েছে সর্পদংশনে, এক পুত্রকে নিয়ে গেছে শ্যেনপক্ষী, অপর পুত্রটি অচিরাবতী জলে ডুবে মরেছে, মহাদুর্যোগে গৃহ ভেঙ্গে, তাতে চাপা পড়ে মাতা, পিতা ও ভ্রাতা তিনজনেরই মৃত্যু হয়েছে, তিনজনকেই এক চিতায় দাহ করা হয়েছে। ভগবন্, আমার দারুণ দুঃখ। সর্বহারা-দিশাহারা হয়ে আমি কেঁদে কেঁদে ঘুরে বেড়াচ্ছি!"

তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ বললেন— "পটাচারা, তোমার কোনো চিন্তা নেই। তোমার ত্রাণ, শরণ ও আশ্রয় হবার মতো সামর্থবানের নিকটই তুমি উপস্থিত হয়েছো। কেবল এ জীবনে যে পতি-পুত্র, মাতা-পিতা ও

ভ্রাতার মৃত্যুতে তোমাকে কাঁদতে হচ্ছে তা নয়, এর পূর্বেও অনন্ত জন্মপুত্রাদি আত্মীয়-স্বজনের জন্য যে কেঁদেছো, চোখের সে জল যদি একত্র করা হয়, চার মহাসমুদ্রের জলের চেয়েও অধিক হবে। কখন থেকে তোমার যে, সংসার পরিভ্রমণ আরম্ভ হয়েছে, তা নির্ধারণ করা দুঃসাধ্য। এর আদি সীমারেখা দিব্যদৃষ্টিরও অগোচর। কেন তুমি প্রমাদিত হচ্ছ?"

তথাগত ভাষিত এই একান্ত সত্যবাণীর মর্মার্থ উপলব্ধি করে পটাচারার মনোদুঃখ লাঘব হয়ে গেল। সম্বুদ্ধ তার চিত্তের অবস্থা জ্ঞাত হয়ে উপদেশ পূর্ণ গাথা দেশনা করলেন–

"পিতা-পুত্র অবথা আত্মীয়বর্গ কেউই রক্ষা
করতে পারে না। মৃত্যুগ্রাসে পতিত হলে,
তোমার রক্তের সম্বন্ধ জ্ঞাতিও তোমায় রক্ষা
করতে বা আশ্রয় দিতে পারবে না। এ সত্য
জ্ঞাত হয়ে শীল ও সংযম পরায়ণ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি
যথাসত্বর নির্বাণপথ পরিস্কার করে নেন।"

সুগতের এ অমূল্যবাণী পটাচারার তৃষিত অন্তরে অমৃত বর্ষণ করল। তিনি হলেন স্রোতাপন্না। তাঁর চিত্ত-গ্লানি হলো বিদূরিত। দারুণ দুঃখের হলো নিরসন। নৈর্বাণিক চির সত্যের রশ্মি সম্পাতে তাঁর আলোকোজ্জ্বল। জগতে এমন শান্তি, এমন প্রীতি সুখ যে বিদ্যমান আছে, এটা ছিল তাঁর ধারণার অতীত। তাঁর আগ্রহ বেড়ে গেল, তিনি জানতে চান, দেখতে চান-এশান্তি এ প্রীতি-সুখের উৎস কোথায়। পেতে চান তিনি দুঃখের চির নিবৃত্তি।

প্রীতিময়ী পটাচারা প্রীতবাক্যে বললেন– "শান্তি-নির্ঝর ভগবান আমার নির্জন সাধনার উপায় করুন। আমি জিনশাসনে প্রব্রজ্যা লাভের ইচ্ছা করি।" শাস্তা প্রসন্নকণ্ঠে বললেন– "সাধু, সাধু, পটাচারা সুগত-শাসনে তোমায় প্রব্রজ্যা দেওয়া হবে। সর্বদুঃখান্তকারক প্রব্রজ্যা ধর্ম সম্যক্ প্রতিপালনে উৎসাহিত হও, তাতে আত্মনিয়োগ কর।" তথাগত তাঁকে ভিক্ষুণীদের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। লব্ধ হলো পটাচারার প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা। অনন্যমনে প্রতিপালন করতে লাগলেন তিনি ভিক্ষুণীর

প্রতিপাল্য নিয়মাবলী, বিনয়শীল। প্রব্রজ্যার অনাবিল সুখে তিনি এখন সুখিনী। সে সুখ অনুপমেয়।

সুখ দ্বিবিধ। একটা গৃহী সুখ, অপরটা প্রব্রজ্যা সুখ। গৃহী সুখ–তৃষ্ণা বিজড়িত, সন্তাপ বহুল। প্রব্রজ্যা সুখ–নৈর্বাণিক রসে রসিত, বিরাগের অমৃত ধারায় সিক্ত, পরাশান্তির স্নিগ্ধতায় ও শীতলতায় পরিপূর্ণ, শান্ত-মুক্ত-সমিত।

ভিক্ষুণী পটাচারা আধ্যাত্মিক চিন্তায় মগ্ন থাকেন। 'অনিত্য-দুঃখ-অনাত্মা'– এ ত্রিলক্ষণ ভাবনায় তিনি আত্মনিয়োগ করেছেন। উদয়-ব্যয় যা–উদয় হয়, তা ব্যয় হয়, ধ্বংস হয়, এটা চির সত্য। প্রাণীকুল জন্মমৃত্যুর অধীন। জন্ম হলেই মৃত্যু অনিবার্য, এটা জাগতিক বিধান। যা অনিত্য–তাই দুঃখপূর্ণ। যেটা অনিত্য ও দুঃখপূর্ণ সেটা আমার বা আমি মনে করা নিতান্তই ভুল, অজ্ঞানতা প্রসূত, মোহের পূর্ণবিকাশ। এসব চিন্তায় তিনি তন্ময় হয়ে যান। তখন তাঁর বাহ্যিক-জ্ঞান লুপ্ত হয়ে যায়। প্রব্রজ্যা জীবনে এই তো সুখ। আধ্যাত্মিক চিন্তা বা ভাবনা অমৃতরসে ভরপুর। বুদ্ধ বলেছেন– "ত্রিলক্ষণ ভাবনায় অভিনিবিষ্ট যোগী অমৃত ভোগ করে, পরমামৃতের আস্বাদ পায়।" যোগিনী পটাচারা রাত্র-দিন অমৃত ভোগই করছেন।

একদিন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। ত্রিলক্ষণ ভাবনানিরতা অভিরমিতা ভিক্ষুণী পটাচারা পাদপ্রক্ষালন করছেন। তিনি পাত্রপূর্ণ জল নিয়ে প্রথম কিছু জল তাঁর পায়ে ঢাললেন। সে জল মাটিতে পড়ে কিছুদূর গেলে মাটি তা শোষণ করে ফেল্‌ল। দ্বিতীয়বার আর কিছু জল ঢাললেন, সে জল আরো কিছু অধিক দূর গেল এবং মৃত্তিকা সিক্ত করল। তৃতীয়বার ঢাললেন অবশিষ্ট জল, সে জল আরো কিছু অধিক দূর গেল এবং তা মাটি শোষণ করল। এ তিনবারের তিন প্রকার অবস্থা, এটাই তাঁর অনিত্য ভাবনাময় চিত্তে প্রবল ইন্ধন জোগাল। তিনি চিন্তা করলেন তুলনামূলক–যা তাঁর আপন জীবনেও ঘটেছে, যা তাঁকে করেছিল–পীড়িত, ব্যথিত, বিধ্বস্ত– "আমার প্রথম সিঞ্চিত জলের মতো এ জগতে কারো কারো মৃত্যু হয় প্রথম বয়সে; দ্বিতীয়বারের দূরতর গত জলের মতো মধ্যম বয়সেও মৃত্যু হয়। তৃতীয় বারের দূরতম গত জলের মতো অন্তিম বয়সেও মৃত্যু হয়।" এরূপে অনিত্য ভাবনায় মন

সংযোগ করে প্রদীপ হস্তে প্রবেশ করলেন আপন প্রকোষ্ঠে। মঞ্চের উপর সমাসীন হয়ে প্রদীপ নির্বাপিত করলেন এবং ভাবনায় অভিনিবিষ্ট হলেন। ক্রমশঃ গভীর ধ্যানে মগ্ন হলেন তিনি।

তখন সর্বজ্ঞবুদ্ধ আপন বাসস্থান গন্ধকুঠিতে অবস্থান করছিলেন। তিনি দিব্যদৃষ্টিতে সন্দর্শন করলেন পটাচারার বর্তমান চিত্তাবস্থা। উপযুক্ত সময় মনে করে সম্বুদ্ধ আপন বাসস্থানে বসেই এমন এক স্নিগ্ধ-সুন্দর অপূর্ব জ্যোতিঃ পটাচারাকে লক্ষ্য করে বিকশিত ও প্রসারিত করলেন যে, তাঁর ধ্যান-নিমীলিত চোখেমুখে সে আলো পড়তেই তিনি চোখ মেললেন। দেখতে পেলেন সে জ্যোতি'র মধ্য দিয়ে জ্যোতির্ময় বুদ্ধ যেন তাঁর সম্মুখে দিব্যাসনে সমাসীন হয়ে রয়েছেন। তাঁকেই লক্ষ্য করে তিনি বলছেন– "পটাচারা, রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এ পঞ্চ স্কন্ধের উদয়-ব্যয় সম্বন্ধে যে জন অজ্ঞ, তার শত বৎসরের আয়ুষ্কাল অপেক্ষা উদয়-ব্যয়ে অভিজ্ঞ এবং তা মনশ্চক্ষে সম্যকদর্শনকারী ব্যক্তির ক্ষণকালের জীবন অধিকতর শ্রেয়।" শাস্তার এ একান্ত সত্যবাণী পটাচারার ভাবিত–চিত্তে এমন এক আলোকসম্পাত করল যে–দীপ নির্বাপিত হওয়ার মতো তাঁর তৃষ্ণাও নির্বাপিত হলো। পটাচারা অর্হৎ হলেন। চিত্ত মুক্ত হলো, দারুণ দুঃখের অবসান ঘটলো। তিনি সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত হলেন– অবিদ্যাই দুঃখের মূল, নির্বাণই সুখের উৎস।

"নিব্বানং পরমং সুখং"

পটাচারা অর্হৎ হয়ে এ প্রীতিগাথা ভাষণ করলেন–

"সন্ধ্যাকালে পাদপ্রক্ষালন সময়ে নিম্নগামী
জলগতি নিরীক্ষণ করে–আমার চিত্তকে আমি
শান্ত করলাম, আজানীয় অশ্ব শান্ত হওয়ার
মত। দীপহস্তে বিহারে প্রবেশ করে শয্যা
অবলোকনের পর মঞ্চোপরি উপবেশন করলাম।
তৈলদীপ নির্বাপিত হওয়ায় ন্যায়
আমার চিত্তক্লেশও নির্বাপিত হলো, এটা
করুণাঘন সম্বুদ্ধের মহাকরুণা।

পরিশিষ্ট

অর্হৎ পটাচারা ষড়বিধ অভিজ্ঞানে হলেন শক্তিশালিনী। দিব্যচক্ষু, দিব্যকর্ণ, দিব্যঋদ্ধি, পরচিত্ত-বিজানন জ্ঞান, জাতিস্মর জ্ঞান ও আসবক্ষয় জ্ঞান লাভ হলো তাঁর। তখন তিনি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পেলেন-সুদূর অতীতে তাঁর এক জন্মের অবিস্মরণীয় এক ইতিবৃত্ত।

তখন জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন ভগবান পদুমোত্তর বুদ্ধ। সে'সময়ে হংসবতী নগরে সম্ভ্রান্ত বংশের এক ধনাঢ্যের কন্যা ছিলেন পরম শ্রদ্ধাবতী ও ত্রিরত্নের শরণাপন্না উপাসিকা। এক ধর্মসভায় তিনি শাস্তার ধর্মকথা শুনে খুবই প্রীত হলেন। সে সভায় দেখলেন ভগবান এক ভিক্ষুণীকে গৌরবময় উপাধিতে বিভূষিত করলেন। বিনয়ধারিণী ভিক্ষুণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন এ ভিক্ষুণী। তাই ভগবান তাঁকে 'বিনয়ধারিণী ভিক্ষুণীদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্যা' এ অভিধা মন্ডিত করলেন।

উক্ত উপাসিকা তা দেখে বড়ো আগ্রহী হয়ে উঠলেন। জাগলো তাঁর স্পৃহাঃ তিনিও যেন হতে পারেন একদিন এরূপ গৌরবময় উপাধিতে বিভূষিতা। সশিষ্য বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করলেন নিজ গৃহে। যথাসময়ে বুদ্ধ শিষ্যগণ সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলেন উপাসিকার গৃহে। আহার কৃত্যের অবসানে ভগবানকে বন্দনা করে উপাসিকা বল্লেন– "প্রভু, গতকল্য এক ভিক্ষুণীকে 'বিনয়ধারিণী ভিক্ষুণীদের অগ্র' এ উপাধিতে বিমন্ডিত করলেন। আমিও উপাধি মন্ডিত হতে চাই–ভবিষ্যতে যে কোন একজন সম্যক্ সম্বুদ্ধের নিকট, এই আমার একান্ত প্রার্থনা।

সর্বজ্ঞবুদ্ধ দিব্যদৃষ্টি প্রসারিত করে দেখতে পেলেন উপাসিকার প্রার্থনা সাফল্যমন্ডিত হবে। তখন সুগত প্রকাশ করে বললেন– "উপাসিকে, তোমার প্রার্থনা ফলবতী হবে। আমার পর অনুক্রমে জগতে আবির্ভূত হবেন– সুমেধ, সুজাত, পিয়দস্সী, অত্থদস্সী, ধম্মদস্সী, সিদ্ধাত্থ, তিস্স, ফুস্স, বিপস্সী, সিখী, বেস্সভু, ককুসন্ধ, কোণাগমন, ও কস্সপ, এ চৌদ্দজন সম্যক্ সম্বুদ্ধ অতীত হলে তারপর আসবেন গৌতম বুদ্ধ। তাঁর শাসনে হবে তুমি পটাচারা নাম্নী ভিক্ষুণী। তুমিই হবে গৌতম বুদ্ধ প্রদত্ত উপাধি ভূষিতা– "বিনয়ধারিণী ভিক্ষুণীদের মধ্যে অগ্র-শ্রেষ্ঠ।"

এখন পটাচারার প্রার্থনা হয়েছে সিদ্ধ। পদুমোত্তর বুদ্ধের বাণী ও আশীর্বাদ হয়েছে সার্থকে পরিণত। অর্হৎ ভিক্ষুণী পটাচারা বিনয় পিটকে অসাধারণ জ্ঞানার্জন করলেন। বিনয়ের সূক্ষ্ম বিচারে ভিক্ষুণীদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সুদক্ষ। বিনয়শীলের প্রতি গৌরব, পালনে দৃঢ়তা, ধারণে অসাধারণ ক্ষমতা, বিশ্লেষণে গভীর জ্ঞান ইত্যাদি সর্বগুণে ছিলেন তিনি গরীয়সী। তাই ভগবান গৌতম বুদ্ধ মহাপরিষদকে তাঁকে বিভূষিত করলেন এ অভিধায়– "বিনয়ধারিণী ভিক্ষুণীদের মধ্যে পটাচারাই সর্বাগ্রগণ্যা।"

(ধর্মপদার্থকথা, থেরীগাথা)

৫। অম্বপালী

(১)

সুদূর অতীতের কথা। অম্বপালীর সৌভাগ্য যে–তখন তিনি বুদ্ধভগ্নী হয়েই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ভ্রাতা 'ফুস্‌স' বুদ্ধ তখন জগতে আবির্ভূত হয়ে দেব-মানবকে ধর্মামৃত বিতরণে প্রবৃত্ত ছিলেন। যে বোনের ভাই বুদ্ধ, সে বোনকে অবশ্য ভাগ্যবতীই বলতে হবে। এ কারণে তিনি গৌরবান্বিতা হবারই কথা। বিশ্বপূজ্য ভ্রাতার উপদেশ ভগ্নী কিঞ্চিন্মাত্রও যদি আপনার মধ্যে প্রতিফলিত করতে না পারলেন, তবে বুদ্ধভগ্নী হয়ে তাঁর জন্মানোর সার্থকতা কোথায়? এ হেতু, সশ্রদ্ধ অন্তরে সে' বৌদ্ধনারী বুদ্ধ-ভ্রাতার অমৃতময় ধর্মোপদেশ শুনতেন। শুধু তা নয়, দানাদি সৎকাজ করে এরূপ প্রার্থনা করতেন যে– 'জন্মান্তরে তিনি যেন রূপ-লাবণ্যের অধিকারিণী হন।

মানব যেমন মরণশীল, তেমন জনমশীলও। এক জন্মে এর জন্মান্ত র-রেখার পরিসমাপ্তি ঘটে না। জন্মে জন্মেই তার কৃতকর্মের জের টেনে যেতে হয়, যতদিন না তার চরম-মুক্তি ঘটে। এ অপ্রতিহত কার্য-কারণের দরুণ এ নারী আবার যখন এক সময় ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, তখন ধর্মাধিপতি 'সিখী' বুদ্ধ ধর্মশাসনে প্রজারঞ্জন করছিলেন। এ করুণাময় বুদ্ধের ধর্ম শুনে এ ধনী কন্যার নারী হৃদয় দ্রবীভূত হলো, ধর্মপ্রীতি জাগ্রত হলো অভূতপূর্ব, দুঃখমুক্তির ঐকান্তিক বাসনায় বিরাগের ছোঁয়া লাগল তাঁর মর্মস্থলে। দীক্ষা গ্রহণ করলেন

তিনি ভিক্ষুণীধর্মে। ভিক্ষুণী জীবনের কঠোর-ব্রত নিয়মানুবর্তিতার সাথে সমভাবেই আচরণ করে তিনি সুখী হলেন।

একটানা সুখের মধ্য দিয়ে কিন্তু তাঁর জীবন কাটল না। তাঁর ভাগ্যাকাশে দেখা-দিল কালমেঘ। একদিন এক অর্হৎ ভিক্ষুণীকে তিনি আক্রোশ সহকারে মন্দবাক্য বলে ফেললেন। ঘটনা এই যে এক দিবস কতিপয় ভিক্ষুণী সহ তিনি চৈত্য বন্দনায় গমন করেন। তাঁদের মধ্যে কেহ কেহ সাধনার পরমা প্রতিভায় (অর্হত্ব) প্রতিভাশালিনীও ছিলেন। সবাই চৈত্য-প্রাঙ্গণে উপনীত হয়ে সমবেতভাবে পূজা-বন্দনা কার্য সম্পন্ন করলেন। তারপর তাঁরা চৈত্য-প্রদক্ষিণে প্রবৃত্ত হলেন। নব দীক্ষিতা ভিক্ষুণীর পূর্ববর্তিণী যিনি-তিনিই অর্হৎ। প্রদক্ষিণের সময় তাঁর হাঁচি ক্ষেপণ হলে, কিছু পরিমাণ সিক্‌নি অলক্ষিতে চৈত্যাঙ্গণে পড়ল।

সেই ধনীর দুলালীর ভিক্ষুণী জীবনে দুর্দশা ঘনিয়ে এলো। তিনি অগ্রবর্তিণীর অনুসরণ করতেই পতিত সিক্‌নি তাঁর দৃষ্টি এড়াতে পারল না। সিক্‌নি দেখে তিনি ক্রুদ্ধ হলেন এবং অগ্র-পশ্চাৎ না ভেবে বলে ফেললেন– "না জানি, কোন্ শাসন-দোষিণী, অনাচারিণী বারাঙ্গনা এমনতর পবিত্রস্থানে সিক্‌নি ফেলেছে।"

ভাবী অম্বপালীর এ আক্রোশবাক্য তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনাকাশে কী যে কাল যবনিকাই পতিত করবে, এটা তিনি বুঝতে পারলেন না। কিন্তু, এটাই ঠিক যে–তিনি নিজের অমঙ্গলের পথই পরিস্কার করে ফেললেন। অবশ্য তাঁর দুঃখের বোঝা এতখানি ভারী হতো না- যদি না সে ভিক্ষুণী অর্হৎ হতেন। অর্হৎ ভিক্ষুণীকে এরূপ আক্রোশপূর্ণ দুর্বাক্য প্রয়োগ করায় ধর্মের শাসনে তিনি রেহাই পেলেন না। মৃত্যুর পর তিনি নরকাশ্রিতা হলেন।

(২)

সুদীর্ঘকাল অতীত হয়ে গেল। দুঃসহ নরক-যন্ত্রণা ভোগ করার পর আবার তিনি নারী হয়ে জন্ম লাভ করলেন মানবকুলে। পূর্ব পুণ্য প্রভাবে মানবজন্মে তিনি সুখ-যশের অধিকারিণী হলেন বটে, কিন্তু সে' অনাচারিণী ও বারাঙ্গণা প্রভৃতি দুর্বাক্য প্রয়োগজনিত পাপ থেকে এখনও নিষ্কৃতি পেলেন না। তাঁর দুষ্কর্মের যথোপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত এখনও হয়নি। কর্ম বিপর্যয়ে তাঁকে নগরশোভিনী বারাঙ্গনা সাজতে হলো।

কর্মপ্রভাবে মানুষ কিনা হতে পারে–কোথায় বুদ্ধভগ্নী, আর এখন কোথায় বারাঙ্গনা! তবুও তাঁর এ গণিকাবৃত্তি একজন্ম-দু'জন্মে শেষ হয়নি, দশ হাজার বৎসর গণিকাবৃত্তি করেও যে তার উপযুক্ত প্রতিকার হলো না, এটাই বিস্ময়ের বিষয়।

তারপর অতীত হলো সুদীর্ঘকাল। আবির্ভূত হলেন ভগবান 'কশ্যপ' বুদ্ধ। তাঁর শাসনকালে ভাবী অম্বপালীর জীবনের কিঞ্চিৎ উন্নতি সাধিত হলো। তিনি এ যাত্রায় ব্রহ্মচারিণী ধর্ম অবলম্বন করতে পেরেছেন। এ কারণে, মৃত্যুর পর তিনি "তাবতিংস" স্বর্গে উৎপন্ন হলেন। কিন্তু, এ সুখ তাঁর জন্ম-জন্মান্তরের সুখে পরিণত হতে পারল না।

চিরমুক্তি লাভ না হওয়া পর্যন্ত মানবের জন্মান্তর ধারা শেষ হয় না। ভগবান গৌতম বুদ্ধের শাসনকালে এ রমণীর জন্ম-প্রবাহ থেমে যাবে। সুতরাং এ জন্ম তাঁর অন্তিম জন্ম, আবার এ মৃত্যুই তাঁর চিরমৃত্যু। স্বর্গবাসিনী এ দেববালার স্বর্গের আলো নিষ্প্রভ হয়ে এলো। আলো নিভে যেতেই দেখলেন তিনি মানবকুলের প্রদীপ। দেখলেন–মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করে নয়, বৈশালীর মনোরম রাজোদ্যানে আম্রশাখান্তরে ঔপপাতিকরূপে জন্মগ্রহণ করে। অতীতে যে জন্মে তিনি ভিক্ষুণীত্ব লাভ করেছিলেন, সে জন্মে গর্ভবাসের প্রতি বিরাগই তাঁর কাছে বিরাটরূপে দেখা দিয়েছিল। এ বিরাগই তাঁর জীবনকে ঘৃণ্য করে তুলল। তাই তিনি ভবিতব্যে ঔপপাতিক জন্ম লাভেরই আন্তরিক প্রার্থনা করে রেখেছিলেন। উদ্যানপাল এ সুদর্শন নারী শিশুকে দেখে সবিস্ময়ে রাজহস্তে সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হলো। অম্বশাখান্তরে জন্ম হেতু রাজা এর নাম রাখলেন– 'অম্বপালী'।

কয়েক বৎসর পরের কথা। অম্বপালী ক্রমে কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে পদার্পণ করেছেন। এখন রূপ-মাধুরী তাঁর লতিকাদেহ ফেটে পড়তে চায়। তা অবশ্য অতীত জন্মের কুশলকর্ম ও প্রার্থনার ফল। তেমনি কিন্তু, অতীতের কৃত দুষ্কর্ম হেতু এ রূপলাবণ্য তাঁকে ঘৃণার পথে যে টেনে নেবে, এটা তিনি বুঝতে পারেন নি। অম্বপালীর অসামান্য এ রূপ-লালিত্য বৈশালীর রাজকুমারদের সমভাবে মুগ্ধ করল। সকলেই পেতে চায় অম্বপালীকেই তাঁর পাণিপ্রার্থী। তাঁদের মধ্যে ভীষণ প্রতিযোগিতা আরম্ভ হলো অম্বপালীকে কেন্দ্র করে।

একাধারে তাঁর নয়নাভিরাম রূপ-লাবণ্য, বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠস্বর ও ভুবনমোহিনী নৃত্য-ভঙ্গিমা-ত্রিবেণীর ত্রিধারার মতো অম্বপালীর মধ্যে বয়ে চলছে। কিন্তু, একজন নারীকে সকলে লাভ করতে পারে কিরূপে, এটাই হলো সমস্যা। সমস্যার সমাধান হলো–সকলে সমভাবে লাভের উপায়স্বরূপ তাঁকে গণিকা-বৃত্তিতে নিযুক্ত করা হ'ল।

কিছুদিন গত হলো। মগধরাজ বিম্বিসার তখন তরুণ যুবক। তাঁর কর্ণগোচর হলো–যুবতী অম্বপালীর রূপ-মাধুর্যের প্রশংসা কাহিনী। শুনে মুগ্ধ হলেন বিম্বিসার। উদ্বেলিত করে তুলল তাঁকে। তাঁর মনে জাগল কামনা-বাসনার তীব্র তাড়না, অনুরাগের প্রবল আকর্ষণ।

একদিন ছদ্মবেশে মগধরাজ উপনীত হলেন নগরশোভিনী অম্বপালীর প্রমোদ ভবনে। তাঁর চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হলো। অম্বপালীর অপূর্ব লাবণ্যচ্ছটা, বিলোল কটাক্ষ, মনোরম অঙ্গ-সৌষ্ঠব দেখে তিনি বিমুগ্ধ হলেন। সেদিন তাঁর রাজপ্রাসাদে আর ফেরা হলো না।

রাজা বিম্বিসারের সহিত অম্বপালীর মিলন ঘটল বড়ো শুভক্ষণে। এ মিলন একদিন এনে দেবে অম্বপালীর ভাগ্যকাশে সুখ-সূর্যের আবির্ভাব। বৈশালীর নগরশোভিনী, জগৎ কল্যাণী শান্তির মন্দাকিনী।

অম্বপালী হলেন অন্তঃসত্ত্বা। রাজা উপহারস্বরূপ প্রদান করলেন বহু অর্থ, আর হীরা-মুক্তার অলঙ্কার। দশমাস অতীত হলো। সুবর্ণ-প্রতিমা সদৃশ এক পুত্রসন্তান লাভ করে অম্বপালী অনুভব করলেন মাতৃত্বের গৌরব। এ নবজাত সন্তানের নামকরণমূলে রয়েছে অতীত জন্মের এক অপূর্ব কাহিনী। কথিত আছে– এ শিশু অতীত জন্মে চারটি স্বর্ণময় পুষ্পের দ্বারা 'বিপশ্বীৎ' বুদ্ধে পূজা করেছিলেন। তখন সর্বজ্ঞবুদ্ধ এমন এক অলৌকিক-শক্তি (ঋদ্ধি) বিকাশ করলেন যে–তদ্দ্বারা হয়েছিল চতুর্দিকে উদ্ভাসিত। সম্বুদ্ধের এ আলোকসামান্য প্রতিভা দর্শনে যুগপৎ–তিনি হয়েছিলেন বিস্মিত ও আনন্দিত। এ আনন্দানুভূতির মহাপুণ্যই তাঁর ভবিষ্যৎ করেছিলো উজ্জ্বল। সে পুণ্যেই তিনি মৃত্যুর পর 'তুষিত' স্বর্গে জন্ম লাভ করেছিলেন। ইহজন্মে সে পুণ্যেই হয়েছিলেন সুদর্শন ও বিমলকান্তি। তাই তাঁর নাম হলো– 'বিমল কোন্ডণ্য'।

সময় কারো জন্য অপেক্ষা করে না। ক্রমে মাসের পর মাস বৎসরের পর বৎসর অতীত হয়ে যায়। স্নেহের বিমলকে নিয়ে অম্বপালীর সুখের দিন সমভাবেই অতিবাহিত হচ্ছে।

একদিন ভগবান গৌতম বুদ্ধ বৈশালীতে পদার্পণ করে সকলকে ধর্মোপদেশ প্রদান করেছিলেন। বুদ্ধের অমৃতময় বাণী অম্বপালীর চিত্তকে আকৃষ্ট করল। তিনি ধর্মভাবে জাগ্রত হলেন। নৈর্বাণিক-ধর্মের বিমুক্তি-সাগরে অম্বপালীর নারী হৃদয়ের শ্রদ্ধা ঠাঁই পেল না।

ছোট ছেলে-মেয়েদের চিত্ত কাঁচের মতো নির্মল ও স্বচ্ছ। কাঁচের সম্মুখে যে'রূপ তুলে ধরা হয়, সে'রূপই তা'তে প্রতিফলিত হয়। ছোট শিশু বিমলের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জ্ঞানও তদ্রূপ বেড়ে চলেছে। শাক্যমুনির প্রতি মা অম্বপালীর অচলা শ্রদ্ধা ও অটল বিশ্বাস, বিমলের মধ্যেও তা বিকাশ লাভ করল। পুণ্য-সংস্কারের প্রবল আকর্ষণে বিমল বুদ্ধশাসনে দীক্ষা নেবার জন্য আকুল হয়ে উঠলেন। একদিন আকুলতার আতিশয্যে মা'কে বলে বসলেন– "মা, ভগবান বুদ্ধের যা' ধর্মব্যাখ্যা শুনে আসছি, তা তো গৃহবাসে থেকে সম্যক্ আচরণ করা সম্ভব নয়। ব্রহ্মচর্যের মাধ্যমে মুক্তির সন্ধানার্থ আপনি আমায় বুদ্ধ-শাসনে দান করেন না কেন?"

পুত্রের এ অভাবনীয় প্রশ্নে অম্বপালী যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হলেন। ছেলের মনোভাব তিনি সম্যক্ উপলব্ধি করে বললেন– "সাধু বিমল, তোর এরূপ সুমতিই আমি চেয়েছিলাম। একমাত্র তুই-ই আমার অঞ্চলের নিধি, চক্ষের মণি, হৃদয়ের আনন্দ। বাবা, তোর শাসনিক জীবনের জন্য বুদ্ধ শাসনে তোকে দান করে, এ ভেবে প্রাণে প্রবোধ দেবো যে আমি মা হয়ে তোকে সত্য ও অহিংসার পথে ছেড়ে দিতে পেরেছি।

অচিরে অম্বপালী পুত্র বিমলকে বুদ্ধশাসনে উৎসর্গ করে দিলেন। বিমল কোন্ডণ্য ক্রমে প্রব্রজ্যা-উপসম্পদায় উন্নীত হয়ে সমাধি ভাবনায় নিজকে নিয়ন্ত্রিত করলেন। তাঁর সাধনা সার্থক হলো। তিনি তৃষ্ণা ক্ষয় করলেন। অর্হৎ ফল সাক্ষাৎ করে নৈর্বাণিক পরাশান্তি অনুভব করলেন। প্রীতিরসে তাঁর অন্তর ভরপুর হলো। তখন তিনি ভাষণ করলেন এ প্রীতিগাথা–

"আম্রবৃক্ষে উৎপন্ন অম্বপালীর গর্ভে বিম্বিসারের ঔরসে আমি জন্মগ্রহণ করেছি। প্রজ্ঞারূপ কেতু দ্বারা মানরূপ কেতু ধ্বংস করেছি। মহাকেতু ক্লেশমারকে ধ্বংস করে আমি অর্হত্ব ফল সাক্ষাৎ করেছি।"

(৪)

অন্য একদিন। বারবনিতা অম্বপালী শুনতে পেলেন যে– ভগবান বুদ্ধ কোটিগ্রামে উপনীত হয়ে অমৃতোপম ধর্মোপদেশ পরিবেশন করছেন। তিনিও প্রগাঢ় শ্রদ্ধায় অনুপ্রাণিত হয়ে বুদ্ধদর্শন ও ধর্মশ্রবণ মানসে তথাগত সন্নিধানে উপনীত হলেন। সুগতকে বন্দনান্তর তিনি উপবিষ্ট হলে অম্বপালীর চিত্তানুরূপ তিনি ধর্মদেশনা করলেন। দুঃখ-নিবৃত্তির সম্যক্ উপায় শান্তিপ্রদ ধর্মোপদেশে তাঁর চিত্ত হলো স্নিগ্ধ, প্রীতিরসেও হলো পরিপূর্ণ। আগামী দিবসের জন্য তাঁর বাসভবনে বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে তিনি নিমন্ত্রণ করলেন। বুদ্ধের মৌনসম্মতি পেয়ে তিনি প্রফুল্লমনে গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্তন করলেন।

বৈশালীর লিচ্ছবিদের সাথে তাঁর দেখা হলো পথিমধ্যে। লিচ্ছবিকুমারগণ বিবিধ বর্ণের মূল্যবান সুন্দর সজ্জায় সজ্জিত হয়ে মনোরম বিচিত্র রথারোহণে কোটিগ্রাম অভিমুখে চলেছেন। উদ্দেশ্য, তথাগতকে নিমন্ত্রণ করবেন তাঁরা। পথের মধ্যে স্মিতাননা অম্বপালীর দেখা পেয়ে সবাই কৌতুকবাক্যে বলে উঠল– 'ব্যাপার কি হে, আজ বড়ো ফুল্লাননা যে!"

অম্বপালী মৃদুহাস্যে উত্তর করলেন–"হবো না? এ যে নারীর স্বভাবধর্ম। এতে আশ্চর্য হবার কি আছে? আজিকার আনন্দের আরো একটু বিশেষত্ব আছে– যেহেতু, আমি সশিষ্য বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করেছি আগামী কালের জন্য।"

লিচ্ছবিদের মনের স্বাভাবিক প্রফুল্লতা একটু ম্লান হয়ে এলো। কারণ, তাঁরাও আসছেন সে উদ্দেশ্যে। তাঁরা একপ্রকার প্রস্তুতও হয়েছেন তজ্জন্য। কিন্তু, অম্বপালী হয়েছে এখন এর প্রতিবন্ধক। তাঁরা নিরাশ হলেও, কিন্তু সম্পূর্ণ আশা ত্যাগ করলেন না। মনে করলেন– "বারাঙ্গনা সাধারণতঃ অর্থ-লোলুপ। যথেষ্ট অর্থের প্রলোভন দেখালে, নিশ্চয়ই তার মত বদলাবে।"

তাঁরা অম্বপালীকে বললেন– "আচ্ছা অম্বি, আমাদের উদ্দেশ্যও তো তোমায় একটু জানান দরকার। এ যে আমরা সবাই চলেছি কোটিগ্রাম অভিমুখে, তা একমাত্র আগামীকালের জন্য বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে নিমন্ত্রণ করতে। কিন্তু, তোমার একজনের জন্য সবাই আমরা নিরাশ হতে বসেছি। তোমার ব্যক্তিগত বাসনার চেয়ে আমাদের সমষ্টিগত বাসনাকে কি বড় করে দেখবে না? আগামীকালের জন্য তোমার নিমন্ত্রিত সশিষ্য বুদ্ধকে আমাদের দাও। এর বিনিময়ে তোমায় লক্ষটাকায় পুরষ্কৃত করবো।"

অম্বপালী তাঁদের কথা শুনে হো হো করে হেসে ফেললেন। তাঁদের এ প্রস্তাবে সত্যই তাঁর নারীহৃদয় বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। কারণ, বারাঙ্গনা হলে কি হয়, একজন নারী হিসাবে এটা তাঁর আত্মমর্যাদায় আঘাত দিয়েছে। আর অহিংস-নির্বিরোধী বুদ্ধের নিকট বারাঙ্গনা ও কুলাঙ্গনার পার্থক্যই বা কি? না, এটা তেমন হতে দেবেন না তিনি।

অম্বপালী ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে অথচ হেসে বললেন– "আমি দুঃখিত যে, আপনাদের এ প্রস্তাবে আমি আপনাদের সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। কারণ, 'অজ্জেব কিচ্চং আতপ্পং' হিসাবে আমার দানকার্য শীঘ্রই সম্পন্ন করতে ইচ্ছা করি। আপনারা লক্ষ মুদ্রার লোভ কেন, সমগ্র বৈশালী প্রাপ্তির লোভ দেখালেও, এতে আমার সম্মত হবার উপায় নেই।"

লিচ্ছবি কুমারগণ অম্বপালীর অসন্তোষের ভাব লক্ষ্য করলেন। তাঁদের একথায় যে তিনি সুখী হতে পারেন নি, এটা তাঁর ক্ষুব্ধ অন্তরের উষ্মা থেকেই প্রকাশ পাচ্ছে। কিন্তু, অম্বপালীর ব্যক্তিগত অসন্তোষকে যে তাঁদের সমষ্টিগত অসন্তোষ ছেপে উঠেছে, এটা তাঁদের বেশ উপলব্ধি হলো। অম্বপালীর মতো একজন গণিকার নিকট যে তাঁদের সমষ্টিগত ইচ্ছা উপেক্ষিত হলো– এ অবমাননা তাঁদের পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠল।

পর দিবস পূর্বাহ্ন। ভগবান তথাগত সশিষ্য অম্বপালীর মনোরম আম্রোদ্যানে উপনীত হলেন। অম্বপালী বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে স্বাগত দেখে সশ্রদ্ধ সংবর্ধনায় সুসজ্জিত আসনে তাঁদের উপবেশন করালেন এবং উত্তমতর খাদ্য-ভোজ্য পরিতৃপ্ত করলেন। ভোজনকৃত্য সম্পন্ন

হলে, অম্বপালী সুগতকে বন্দনা করে বিনীত বাক্যে বললেন– ভগবন্, আমার একান্ত বাসনা যে-আমার এ আম্রোদ্যান আপনাদের দান করি। দয়া করে এ উদ্যান-দান গ্রহণ করলে আমি চির কৃতার্থ হবো।"

তথাগত মৌন-সম্মতিতে অম্বপালীর প্রদত্ত আম্রোদ্যান গ্রহণ করলেন। আবার তিনি ভাবলেন– 'আমার প্রদত্ত এ উদ্যান দিয়ে তাঁরা কি করবেন, যদি তাঁদের বিহরণের জন্য বিহার প্রস্তুত করে না দিই? যতদিন তিনি বিহার নির্মাণ করে দিতে না পারেন, ততদিন তিনি স্বস্তি পাবেন না। সুতরাং অম্বপালী অচিরেই আম্রোদ্যানে সুন্দর ও চারুশিল্প শোভিত এক বিরাট বিহার নির্মাণ করালেন এবং এ নবনির্মিত বিহার বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে দান করে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

(৫)

আনিন্দ্য-সুন্দরী অম্বপালীর জীবন-গাঙে ভাটা ধরেছে। জরাজীর্ণতা ও ব্যাধি-বার্ধক্যের নির্মম নিষ্পেষণে অম্বপালী এখন নিষ্পেষিত। অনিত্যত্ব ও ক্ষণভঙ্গুরত্বের বিষ-বাষ্পে তাঁর সুন্দর-সতেজ তনু-মন বিষাক্ত। যৌবনোন্মাদনার কোনও তীব্র রস তাঁর এ শুষ্ক ও তিক্ত-প্রাণকে আর সরস-মধুময় করে তুলতে পারে না।

তিনি এখন নির্জন প্রিয়। নিরালায় বসে শরীরের অনিত্যত্ব চিন্তা করতেই তিনি ভালোবাসেন। তিনি ভাবেন–

(১) আমার মস্তককেশ ছিল কতো সুন্দর। কুঞ্চিতাগ্র ও সুরভিত ছিল আমার শোভন-মোহন ভ্রমরকৃষ্ণ সুদীর্ঘ কেশরাশি। কনক ও হীরকসূচী সমলঙ্কৃত, পুষ্পমাল্য-শোভিত, সুগন্ধি তৈল সিক্ত কেশকলাপ এখন হয়েছে শশক-লোমের মতো শ্বেতবর্ণ ও দুর্গন্ধযুক্ত। আমার সুদৃশ্য ঘন কেশরাশি এখন হয়েছে বিরল কেশ, জটাযুক্ত ও বিশ্রী।

(২) সুদক্ষ শিল্পীর রেখা-চিত্রের মতো সুন্দর-সুশোভন নীলবর্ণ ভ্রূযুগল হয়েছে বলীযুক্ত ও বিশ্রী।

(৩) সমুজ্জ্বল নীলমণি সদৃশ শোভন-মোহন হরিণনেত্র আমার জরায় হয়েছে জ্যোতিহীন, অভিহত চক্ষুমল সমাকীর্ণ ও শ্রীহীন।

(৪) সুচারু হরিতাল বর্তিকা সম উন্নত শোভমান আমার নাসিকা এখন বক্র-সৌন্দর্যহীন হয়েছে।

(৫) সুবর্ণ-কঙ্কন সদৃশ সুন্দর কর্ণপত্র এখন বলীযুক্ত হয়ে প্রণমিত বস্ত্রখন্ড সম ঝুল্‌ছে।

(৬) শোভন শুভ্র অবিরল কুন্দদন্ত আমার খন্ডিত স্খলিত হয়ে বিশ্রী হয়েছে। যে কয়টা আছে, তাও হয়েছে পীতবর্ণ।

(৭) রম্য কাননে মহানন্দে বিচরণকারিণী কোকিলার সুকণ্ঠ সম আমার সুমধুর মদন-মোহন কণ্ঠস্বর এখন হয়েছে মধুরতা ও মাদকতা হীন! খন্ডদন্ত হেতু শব্দ স্খলিত হয় কথা বলতে।

(৮) সুন্দর ও মসৃণ সুবর্ণশঙ্খানিভ সুগোল, স্নিগ্ধ, কোমল ও সুগঠন গ্রীবা আমার এখন হয়েছে মাংসহীন, শিরাজাল সমাকীর্ণ, বিনত ও বিশ্রী।

(৯) সুন্দর, মনোরম, নিটোল, সুগোল ও মাংসল আমার বাহুযুগল এখন হয়েছে জীর্ণ, বলীযুক্ত, শিরাজাল বেষ্টিত ও বিশ্রী।

(১০) হীরা-মুক্তা খচিত স্বর্ণালঙ্কার ভূষিত মসৃণ-সুন্দর হস্তদ্বয় এখন হয়েছে বিশুষ্ক, বলীযুক্ত ও শিরাজাল বেষ্টিত।

(১১) সুগোল পীনোন্নত পয়োধর এখন জলনিষ্কাশিত চর্ম-স্থাবিকা সদৃশ ঝুল্‌ছে।

(১২) সুমার্জিত কাঞ্চন-ফলক সদৃশ নয়ন-মোহন অপরূপ রূপশ্রী-মন্ডিত আমার শরীর এখন হয়েছে অমসৃণ, বলীযুক্ত ও বিশ্রী।

(১৩) সুন্দর, সুগোল, মাংসল ও মসৃণ আমার উরুপ্রদেশ এখন হয়েছে বংশপর্ব সদৃশ বিশ্রী।

(১৪) স্বর্ণনুপূরে বিভূষিত স্নিগ্ধ, মসৃণ ও মনোরম জঙ্ঘা প্রদেশ এখন রক্ত-মাংসহীন কৃশ হয়ে বিশুষ্ক তিলদন্ড সদৃশ হয়েছে।

(১৫) সিম্বলীতুলাপূর্ণ সুন্দর-মসৃণ পাদুকা সদৃশ আমার পদদ্বয় এখন হয়েছে ফালিত, বলীযুক্ত ও শ্রীহীন।

(১৬) আমার শরীরের সন্ধি-বন্ধ হয়েছে শিথিল। এ দেহ বহু দুঃখের আগার, প্রলেপ পরিক্ষয় পতনোম্মুখ জীর্ণ গৃহ সদৃশ। ভগবান বুদ্ধ যথার্থই বলেছেন, প্রাণীজগৎ ও জড়জগৎ অনিত্যে কবলিত। জগতে চিরস্থির কিছুই নেই।

অম্বপালী কখনও কখনও ভাবেন– "আমার অনিশ্চিত এ বিষাক্ত-দুঃখময় জীবনের জন্য কেবল কি বার্ধক্যই দায়ী? না, কেবল বার্ধক্য

নয়। এর জন্য দায়ী-আমার মিথ্যা-ভ্রান্তি, আর ভ্রান্তির মালিক আমি নিজে। কারণ, আমি শূন্যের মধ্যে খুঁজেছিলাম পূর্ণকে; অস্থির-চঞ্চলের মধ্যে খুঁজেছিলাম চিরশান্তিকে; ভোগের মধ্যে খুঁজেছিলাম– পরাশান্তিকে।"

এখন তার প্রমাণ পেয়েছেন তিনি মর্মে মর্মে-তাঁর ক্রম-বিলীয়মান সেই যৌবনে, তাঁর সেই নিটোল দেহে, তাঁর সেই রূপ-মাধুর্যে, তার সেই ভ্রমরকৃষ্ণ কেশকলাপে, তাঁর সেই মুক্তা-শুভ্র দন্তে, তাঁর সেই হরিণাক্ষিতে, তাঁর সেই কোকিল-বিনিন্দিত কণ্ঠস্বরে, তাঁর জীবনের সব কিছুতেই। এখন তিনি উপলব্ধি করলেন– "সংসার অনিত্য, রূপ-যৌবন ক্ষণস্থায়ী।"

একদিন অম্বপালীর এ ধারণাকে আরো দৃঢ়তর করে দিল– তাঁর গর্ভজাত পুত্র বিমল কোন্ডণ্যের ধর্মোপদেশ। ইনি যখন শাস্তার বাসনা-বিলয় মুক্তিবাণী প্রচার করে দেশ-দেশান্তর পরিভ্রমণ করেছিলেন, তখন অম্বপালীর সুযোগ ঘটল আপন পুত্রের মুখে ধর্ম শোনবার। এ ধর্ম শ্রবণই তাঁকে সাংসারিক হীন গণিকা-জীবনে করে তোলে বীতস্পৃহ। সুখের মায়ামরীচিকা রূপান্তরিত হয়ে দেখা দিল দুঃখ-বিভীষিকার রুদ্রমূর্তিরূপে। তাই তিনি অবিলম্বে ভিক্ষুণীব্রত অবলম্বন করে অবশিষ্ট জীবন বিদর্শন-সাধনায় আত্মনিয়োগ করলেন। এতেই তাঁর সম্যক্ উপলব্ধি হলো জগতের ক্ষণস্থায়িত্ব, ত্রিলোক দুঃখের আকর, আত্মার অস্তিত্ব রিক্ত-শূন্য। অনুক্রমে তিনি চার প্রতিসম্ভিদা (অর্থ, ধর্ম, নিরুক্তি ও প্রতিভান) সহ ঋদ্ধিশক্তি, দিব্যচক্ষু, দিব্যকর্ণ, পরচিত্ত বিজানন জ্ঞান ও জাতিস্মর জ্ঞান প্রভৃতি প্রতিভায় প্রতিভাশালিনী হয়ে অর্হত্ত্ব ফল সাক্ষাৎ করলেন।

(থেরীগাথা)

৬। সুমেধা

(১)

আড়াই হাজার বৎসর আগেকার কথা। তখন "মন্তাবতী' ছিল ভারতের অন্যতম প্রসিদ্ধ নগরী। এ দেশের অধিপতি ছিলেন নৃপতি কোঞ্চ। তাঁর অগ্রমহিষীর পুণ্যগর্ভে জন্ম নিয়েছিলেন 'সুমেধা'।

রাজকন্যা সুমেধা ছিলেন বড় পুণ্যবতী, পুণ্যলক্ষণ বিমন্ডিতা। বড় মনোরম-সমুজ্জ্বল তাঁর লাবণ্যচ্ছটা। জ্যোৎস্নার মত মনোরম-মদিরতা মাখান তাঁর রূপ। কেবল যে রূপবতী ছিলেন তা নয়, এর চেয়েও সুন্দর-পবিত্র ছিল তাঁর অন্তর। মুখে হাস্যমধুর প্রসন্নতায় স্বতঃই প্রতিপলিত হয়ে থাকে তাঁর শুভ্র হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি।

তখন মুনিশ্রেষ্ঠ শাক্যমুনির পরাশান্তির উৎস নৈর্বাণিক ধর্মের প্রাণস্পর্শী বাণী ভারতের নগরে-গ্রামে প্রতি ঘরে ঘরে আলোড়ন জাগিয়ে তুলেছে অভূতপূর্ব। জাগিয়ে তুলেছে প্রাণে পুলক-শিহরণ। উদ্বুদ্ধ হল জনগণের সন্ধানী অন্তর। সার্বভৌম-সার্বজনীন অমৃত বাহন সত্যধর্মের মোহন-মধুর সুর রণিত হল দিকে দিকে, আকাশে-বাতাসে। ক্ষেমঙ্কর-সুবিশুদ্ধ ধর্মের অজেয় আকর্ষণে জনগণ আকৃষ্ট হয়ে পড়ল। ভারতে সর্বত্র উড্ডীন হল সদ্ধর্মের বিজয় পতাকা। এ সন্তা পহারী অভিনব ধর্মের প্রতি বালিকা সুমেধার অন্তরেও প্রগাঢ় আকর্ষণ জাগ্রত হল। তিনি জানতে চান নৈর্বাণিক ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব। তাই প্রতিদিন তিনি সহচরীদের নিয়ে বিহারে উপনীত হন এবং অন্তর্দৃষ্টিলাভী অভিজ্ঞ ভিক্ষুণীদের নিকট ধর্মকথা শোনেন। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের প্রতি তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা। দান করেন প্রসন্ন মনে, শীল রক্ষা করেন পরম যত্নে, শিক্ষা করেন আধ্যাত্মিক সাধনার বিষয় ও প্রণালী। তাঁর বুদ্ধি-বিবেচনা চমৎকার, বোধশক্তি অসাধারণ, মেধাশক্তিও অতি প্রখর। তাঁর সঙ্গে নামের মিশ খেয়েছে আশ্চর্য রকম। 'সুমেধা' নামকরণ যেন দেবতারই দান।

সুমেধার প্রত্যেক কাজে ও কথায় মহিমাময়ী ও মহীয়সীর ইঙ্গিত পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তিনি ধর্মোপদেশ যা শোনেন, তা'ই হৃদয়ঙ্গম করেন এবং অন্তরে ধারণ করেন। নিত্য নতুন ধর্ম বিষয় অধিগত করবার জন্য তাঁর খুব উৎসাহ ও একাগ্রতা। গভীর তত্ত্বমূলক আধ্যাত্মিক বিষয়ে তাঁর অনুসন্ধিৎসা অসাধারণ। চুরাশি হাজার ধর্মস্কন্ধে জ্ঞানার্জনের প্রতি তাঁর আগ্রহ ক্রমশঃ বেড়ে ওঠে। অতঃপর তিনি সদ্ধর্মে বহুশ্রুত জ্ঞানের অধিকারী হলেন। কায়গত স্মৃতি তাঁর অন্তরে সমধিক আলোকপাত করল। সময়ে তিনি অনিত্য দুঃখ-অনাত্ম চিন্তায় তন্ময় হয়ে পড়েন। ইহাও তিনি উপলব্ধি করলেন— জন্ম মাত্রই

দুঃখপূর্ণ, তৃষ্ণাই সকল দুঃখের মূল। এ কারণেই তিনি পুনর্ভবে জন্মগ্রহণকে ভীতি চক্ষে দর্শন করে ভোগাসক্তি থেকে নিজকে মুক্ত রাখবার চেষ্টায় তৎপর হলেন।

রাজনন্দিনী সুমেধা এখন যৌবন সীমায় পদার্পণ করেছেন। যৌবনের ছোঁয়া লেগে তাঁর অপরূপ রূপলাবণ্য উচ্ছল হয়ে পড়ছে। ফুটে উঠল তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে দেবদুর্লভ পুণ্যলক্ষণ সমূহ। কিন্তু যুবতী-সুলভ যৌবন-চাঞ্চল্য তাঁকে স্পর্শ করতে পারল না। বিলাস-ব্যসনের প্রতি তিনি একেবারেই উদাসীন। সর্বক্ষণ কি যেন চিন্তা করেন। তাঁর স্বতস্ফূর্ত ফুল্লাননে কেমন এক গাম্ভীর্যের ছাপ এসে পড়েছে।

(২)

'বারণবতী' নগরের রাজা অনিকরত্ব সুপুরুষও প্রিয়দর্শন। তিনি রাজকন্যা সুমেধার রূপ-গুণের কথা শুনে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হলেন। তাঁকে দর্শনের জন্য তিনি আকুল হয়ে পড়লেন। এক সময় তিনি স্বচক্ষে দেখলেন তাঁর মানসী প্রিয়াকে। নৃপসুতার সৌন্দর্য দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন। নৃপতি কোষ্ঠের নিকট তিনি সুমেধার প্রার্থী হলেন। রাজা অনিকরত্তকে সুমেধার সর্বাংশে উপযোগী মনে করে তিনি কন্যা সম্প্রদানের স্বীকৃতি দান করলেন। তিনি এও বললেন যে, রাজা অনিকরত্ত এসে সুমেধার সাথে যেন আলাপ করেন এবং তার সম্মতি গ্রহণ করেন।

সুমেধা একথা শুনে প্রমাদ গুণলেন। তাঁর ইচ্ছা নয় সংসারের জটিলতায় আবদ্ধ হন। তিনি চান গৃহবাস ত্যাগ করে ভিক্ষুণী ধর্মের আশ্রয় নিতে এবং নির্জনে আধ্যাত্মিক চিন্তায় আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু, মাতা-পিতার উদ্দেশ্য জ্ঞাত হয়ে তিনি চিন্তাযুক্ত ও বিমর্ষ হলেন। মাতা-পিতার নিকট উপস্থিত হয়ে তিনি বললেন—

আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে, মৈত্রী-করুণার মূর্ত প্রতীক মাতা-পিতা-পুত্র-কন্যার একান্তই হিতকামী। মাতা-পিতার মত কল্যাণমিত্র এ জগতে দুর্লভ। সুতরাং যা আমার পক্ষে কল্যাণজনক যেরূপ কাজে আপনারা আমার সহায় হবেন, ইহাই আমি প্রত্যাশা করি।

এখন আমি নির্বাণগত প্রাণ, নির্বাণেই অভিরমিত। দেহ দিব্য হলেও নশ্বর-অসার, জন্মমৃত্যুর অধীন, দারুণ দুঃখের আকর, তৃষ্ণার

মূলাধার।

কামতৃষ্ণা সর্পবিষতুল্য কটু, অজ্ঞজন এতেই মোহিত হয়। এসব মোহান্ধ-জন সুদীর্ঘকাল নরকে নিমগ্ন হয়ে অসহ দুঃখ ভোগ করে। কায়-বাক্য-মন যাদের অসংযত, তাদৃশ পাপী জন অপায়ে দীর্ঘকাল শোক প্রাপ্ত হয়।

দুষ্প্রজ্ঞ মূর্খগণ চেতনাহীন, তাই তারা সর্বদুঃখে অবরুদ্ধ। আর্যসত্য সম্বন্ধে তাদের কোনও অভিজ্ঞতা নেই, দেশনা করলেও তারা বুঝে না। আর্যসত্য যারা জ্ঞাত নয়, তারাই জন্মকে অভিনন্দন করে এবং দেবলোকে উৎপত্তির কামনা করে। দেবত্বও চিরস্থায়ী নয়। জন্ম অনিত্য ও দুঃখময়। তবুও মূঢ়গণ পুনর্জন্মকে ভয় করে না।

দুর্গতিকুল চতুর্বিধ, যথা– নরক, প্রেত, অসুর ও পশু-পক্ষীকুল। সুগতি, দ্বিবিধ, যথা– মনুষ্যলোক ও দেবলোক। দুর্গতিকুলে জন্ম লাভ যত সহজ, সুগতি লাভ করা ততোধিক দুষ্কর। দেবলোক অথবা অপায়ে প্রব্রজ্যা লাভের উপায় নেই। ভগবান তথাগতের শাসনে প্রব্রজ্যা লাভের জন্য আপনারা উভয়ে আমার অনুমতি প্রদান করুন। আমি অতন্দ্রিতভাবে জন্ম-মৃত্যুর মূলোৎপাটনে প্রবৃত্ত হব।

পুনর্জন্ম অভিনন্দনকারী অসার ও ঘৃণ্য দেহের কী প্রয়োজন? আমাকে অনুমতি দেন, আমি বুদ্ধ শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে ভবতৃষ্ণা নিরোধ করব। বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছেন, অক্ষণ বিদূরিত হয়েছে, শুভক্ষণ লাভ করেছি, সারাজীবন শীল ও ব্রহ্মচর্য আচরণ করে নির্বাণ সাক্ষাৎ করব।" অতঃপর দৃঢ় বাক্যে বললেন– "আমার মৃত্যু হলেও গৃহী অবস্থায় আর আহার গ্রহণ করবো না।"

সুমেধার কথা শুনে জনক-জননী মর্মান্তিক দুঃখে অভিভূত হয়ে রোদন করতে লাগলেন। সুমেধারও গন্ড-প্রদেশ অশ্রুজলে সিক্ত হল। তিনি ক্রন্দন পরায়ণ হয়ে প্রাসাদতলে ভূমিশয্যায় লুটিয়ে পড়লেন। মাতা-পিতা তাঁকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করলেন, ব্যথিত স্বরে বললেন– "প্রাণাধিক কন্যা, উঠ, কি জন্য দুঃখ করছো? বারণবতী নগরে তোমায় সম্প্রদান করেছি। সুগঠিত অঙ্গ-সৌষ্ঠব, সুন্দর অভিরূপ রাজা অনিকরত্তে এখন তুমি বাগ্‌দত্তা। তুমি তাঁর প্রধানা মহিষী হবে। বংশে, শীল ও ব্রহ্মচর্য রক্ষা এবং প্রব্রজ্যা-জীবন যাপন করা বড়ই কষ্টকর।

তুমি রাজ্ঞী হয়ে প্রভুত্ব ও ধনৈশ্বর্যের অধিকারিণী হবে। তুমি তরুণী, সর্বাধিক সুখ ভোগ তোমার আয়ত্তে। নারী-জীবনের যা একান্ত কাম্য, সেরূপ সুখ-ভোগে লিপ্ত হও। এস বৎসে, স্বামী বরণ কর।

প্রত্যুত্তরে সুমেধা দৃঢ়কণ্ঠে বললেন-- "তা হবে না। বরঞ্চ আমি মৃত্যুবরণ করতে পারি, তবুও তা হবে না। সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবো না। সংসার নিরবচ্ছিন্ন দুঃখময়, সেখানে সুখ কোথায়? সুখ যা বলা হয়, তা জীব-জীবনের মৃগতৃষ্ণিকা মাত্র। জীবনে শুধু দুঃখ, শুধু ক্লেশ, শুধু অশ্রু, শুধু ব্যথা। জীবন যেখানে মৃত্যু-কালিমায় পরিম্লান, জরা-ব্যাধি-শোক-সন্তাপে জর্জরিত, সুখের পরিকল্পনা সেখানে? আশ্চর্য বটে! পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর মধ্যে সুধান্বেষণ মোহান্ধতার পরিচায়ক নয় কি? এ দেহ যে কেবল অসার তুচ্ছ, তা নয়; দারুণ দুঃখপূর্ণও। এ দুঃখের নিরবশেষ নিরোধেই হয় চির সুখের অধিকারী। তাই আমার নিতান্তই প্রয়োজন প্রব্রজ্যার। একথা নিশ্চয়, হয় প্রব্রজ্যা লাভ-নয় মৃত্যু আলিঙ্গন।

কৃমি ও অশুচিপূর্ণ এ পূতিকায় ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধবাহী চর্মের থলি এবং জঘন্য মলনিঃসারী ভস্ত্রা সদৃশ। রক্ত-মাংসের লেপনাচ্ছাদিত কদর্য কৃমিকুলের আলয় ও পশু-পক্ষীর খাদ্য এ দেহের কী বা মূল্য?

চিন্তা করে দেখুন, মৃতদেহ অচিরে শ্মশানে নিতে হয়। তখন তা বিষ্ঠলিপ্ত অব্যবহার্য কাষ্ঠ খন্ডের ন্যায় পরিত্যক্ত হয়। তখন জ্ঞাতিরাও ঘৃণা করে। শৃগাল-কুকুরের খাদ্য এ দেহ শ্মশান-মশানে নিক্ষেপ করে জ্ঞাতিগণ ঘৃণাভরে স্নান করে। অন্যের কথা দূরে থাক্, মাতা-পিতাও তা বর্জন করে।

অস্থি-স্নায়ু সংঘবদ্ধযুক্ত বিষ্ঠা-মূত্র, অশ্রু-থুথু পরিপূর্ণ পচা দেহের প্রতি মানুষেরা আসক্ত হয়। এ দেহ ব্যবচ্ছেদ করে অভ্যন্তরের অন্ত্রাদি অশুচি পদার্থ যদি বের করা হয়, এর অসহ্য দুর্গন্ধে অতিষ্ট হয়ে স্বীয় মাতাও ঘৃণার সাথে ত্যাগ করবে। পঞ্চস্কন্ধ, পঞ্চেন্দ্রিয়, পৃথিবী, অপ, তেজ ও বায়ুধাতু ইত্যাদি ক্ষণস্থায়ী সংযোগ মাত্র। এসবই দারুণ দুঃখদায়ক জন্ম-মৃত্যুর উৎস। এসব চিন্তা করলে এর প্রতি কি অনুরাগী হতে পারে? তবে কা'কে আমি বরণ করবো?

প্রতিদিন তিনশত সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রের প্রহার শতবর্ষ যাবৎ আমাকে যদি

করা হয়, সে মহাদুঃখও আমার শ্রেয়ঃ মনে হবে, যদি এতেই জাগতিক সকল দুঃখের চরম অবসান ঘটে। এরূপ সংসারাবর্ত দুঃখের নিরবশেষ বিনাশই জ্ঞানীজন ইচ্ছা করেন। যাদের পুনঃ পুনঃ মৃত্যু হয়, সুদীর্ঘকাল তারা জন্ম-জরা-ব্যাধি দুঃখ ভোগ করে।

আমি অনন্ত জন্মে অনন্ত অনন্ত দুঃখ ভোগ করেছি। দেব-মনুষ্য লোকে, পশু-পক্ষীকুলে, নরক-প্রেত ও অসুরলোকে দারুণ দুঃখের মধ্য দিয়ে অনন্তবার মৃত্যুবরণ করেছি। অসংখ্য প্রাণী অপায়ে অসহ দুঃখে নিপীড়িত ও নির্যাতিত হচ্ছে। দেবলোক প্রাপ্তিতেও দুঃখের অবসান ঘটে না। একমাত্র দুঃখের বিরাম ঘটে নির্বাণে। নির্বাণ সুখই পরম সুখ। ভগবান তথাগতের বাণী যাঁরা অনুসরণ করেন এবং জন্ম-মৃত্যুর মূলোচ্ছেদের জন্য প্রয়াস পান, তাঁরাই নির্বাণ সাক্ষাৎ করেন। পিত অসার-ঘৃণ্য ভোগ-বিলাসে আমার প্রয়োজন নেই, তা আমার অকাম্য। অদ্যই আমি অভিনিষ্ক্রমণ করবো।"

(৩)

এমন সময় কন্যাদান-অঙ্গীকার লব্ধ অনুরাগ-রঞ্জিত রাজা অনিকরত্ত প্রীত-মনে ভাবীপত্নীর সম্মতি গ্রহণের জন্য স্বীয় রাজধানী বারণবতী হতে মন্তাবতী অভিমুখে অগ্রসর হলেন। একথা শুনে সুমেধা স্বীয় মস্ত কের সুকোমল, আজানুলম্বিত, নিবিড়, ভ্রমরকৃষ্ণ কেশরাজি অসিদ্বারা কর্তন করে নিজ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করলেন এবং দ্বার রদ্ধ করে আধ্যাত্মিক ধ্যানে সমাসীন হয়ে মুহূর্তকালের মধ্যেই লৌকিক প্রথম ধ্যানে সিদ্ধি লাভ করলেন।

সুমেধার এরূপ ধ্যাননিবিষ্ট অবস্থার সময় রাজা অনিকরত্ত মন্তাবতী নগরে উপনীত হলেন। তখন রাজকন্যা অনিত্য ভাবনায় তন্ময়। মণি-কাঞ্চন বিভূষিত অনিকরত্ত ত্বরিত পদবিক্ষেপে নৃপতি কোঞ্চের প্রাসাদে আরোহণ করলেন। কোঞ্চের মুখে তিনি সকল কথা শুনলেন। তবুও তিনি রুদ্ধদ্বারের বহির্দেশে দাঁড়িয়ে প্রেমমুগ্ধ সতৃষ্ণ অন্তরে অনুরাগ মিশ্রিত বাক্যে সুমেধার পাণি প্রার্থনা করলেন। আকুল কণ্ঠে বললেন— "কল্যাণি, তুমি রাজ্ঞী হয়ে প্রভুত ধনৈশ্বর্য ও প্রভুশক্তি উপভোগ কর। তুমি সৌভাগ্যবতী তরুণী। নারী-জীবনের কাম্য সুখভোগে রত হও, পঞ্চ কামগুণে অভিরমিত হও। সংসারে এমন সুখ, এমন বিলাস-

ব্যসন দুর্লভ। ঐশ্বর্যপূর্ণ আমার মনোরম রাজ্য তোমায় অর্পণ করছি, যথেচ্ছা ভোগ ও দান কর। উদ্‌ভ্রান্ত হয়ো না, দুর্ভাবনা ত্যাগ কর, তোমার জনক-জননী দুঃখিত সন্তপ্ত।"

কামতৃষ্ণায় বীতশ্রদ্ধ, মোহহীন রাজনন্দিনী সুমেধা রাজা অনিকরত্তকে বললে– "রাজন্, কামে অভিনন্দন করবেন না। করবেন না এতে আনন্দ ও সুখের অনুসন্ধান। বহুবিধ দোষদুষ্ট কাম পরিভোগ। মনশ্চক্ষে দর্শন করুন– এতে কত দারুণ দুঃখ বিজড়িত রয়েছে।

কামতৃষ্ণা সমুদ্রের ন্যায় দুষ্পার। সসাগরা মহাপৃথিবীর একচ্ছত্র চক্রবর্তী রাজা মান্ধাতা দেবরাজ সদৃশ অখন্ড প্রতাপশালী হয়ে তাবতিংস দেবলোকে রাজত্ব করেছিলেন। তথায় তিনি ৩৬ জন দেবেন্দ্রের ১২৯ কোটি ৬০ লক্ষ বৎসর পরমায়ু লাভ করে দিব্যকাম ভোগে অভিরমিত হয়েও কামতৃষ্ণা সম্পূরণে অসমর্থ হয়ে অতৃপ্ত বাসনা নিয়েই মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়েছিলেন।

আকাশ হতে সপ্তরত্ন বর্ষিত হয়ে যদি দিগন্ত পূর্ণ হয়, তবুও তৃপ্ত হয় না। অতৃপ্ত তৃষ্ণা নিয়েই মানুষের মৃত্যু হয়।

কামরাগ অসি ও শূলের ন্যায় দুঃখদায়ক, উন্নত শির সর্পের ন্যায় ভীষণ, জ্বলন্ত উল্কার ন্যায় দগ্ধকারী, লোভাতুর কুকুর অস্থি চর্বণ দ্বারা মুখাভ্যন্তর ক্ষত-বিক্ষত করার ন্যায় যন্ত্রণাদায়ক।

কামপরিভোগ অনিত্য, অধ্রুব, অনর্থকর, বিরোধ সৃষ্টিমূলক, স্বপ্নের মত প্রপঞ্চময়, ভীতিজনক, প্রাণনাশী এবং মুক্তিমার্গের মহা অন্তরায়, একথা চক্ষুষ্মান বুদ্ধ বলেছেন।

আপনি এখন যেতে পারেন। ভবরাগের প্রতি আমি অনুরাগহীন আস্থাহীন। আমার জন্য কর্তব্য আছে। আমার জন্য অপরে কি করবে? আমার মস্তকের উপর একাদশ প্রকার অগ্নি (জন্ম, জরা, মরণ, লোভ, দ্বেষ, মোহ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও উত্ত্যক্ত) জ্বলছে, বিশেষতঃ জরা-মরণ আমায় অনুসরণ করছে। এর নিরসনের জন্য আমাকে সচেষ্ট হতে হবে।"

একথা বলে সুমেধা প্রকোষ্ঠের দ্বার উন্মুক্ত করলেন। তখন দেখলেন– 'মাতা, পিতা ও রাজা অনিকরত্ত প্রাসাদতলে বসে ক্রন্দন করছেন। রাজকন্যা তাঁদের লক্ষ্য করে বললেন– "অজ্ঞ জনের সংসার

পরিভ্রমণ অতিদীর্ঘ। সুদীর্ঘকাল তাদের পুনঃ পুনঃ রোদন করতে হয়। অনাদিকাল থেকে মাতৃ-পিতৃ মরণ, ভ্রাতৃ মরণ ও নিজ মরণ ভয় অন্ত হীন।

জ্ঞাতির মৃত্যুজনিত দুঃখ এবং জাগতিক অসহ দুঃখে যে পরিমাণ অশ্রু বর্ষিত হয়েছে, তা চার মহা-সমুদ্রের জলের চেয়েও অধিক।

জন্ম-জন্মান্তর যে পরিমাণ মাতৃস্তন্য পান করা হয়েছে, তাও চার মহাসমুদ্রের জলের চেয়ে অধিক।

জন্মে-জন্মে শত্রু হস্তে নিধনজনিত দেহ হতে যে পরিমাণ রক্ত ক্ষরণ হয়েছে, তাও চার মহাসমুদ্রের জলের অধিক।

মাত্র এক কল্পের অস্থি সঞ্চিত হলে বৈপুল্য পর্বতের সমান স্তূপাকার হবে।

দিব্যদর্শী বুদ্ধ ইহাও বলেছেন– আদি অন্তহীন সংসারে পরিভ্রমণকারী এক একজনের মাতা-পিতার সংখ্যা গণনায়–সমগ্র জম্বুদ্বীপের মৃত্তিকা যদি বদরী বীজ প্রমাণ এক একটা গুটিকা করা হয়, তাও সংকুলান হবে না।

মানবজন্ম যে কিরূপ দুর্লভ উপমা স্বরূপ মহাসমুদ্রে কাণা-কচ্ছপ ও একছিদ্র জুয়ালের কথা স্মরণ করলে অনেকটা উপলব্ধি করা যায়, তা স্মরণ করুণ।

এ দেহ জলবুদ্বুদ সদৃশ ক্ষণভঙ্গুর, জঘন্য ও অসার, এও মনশ্চক্ষে নিরীক্ষণ করুন। অনিত্য ও দুঃখের মূল পঞ্চস্কন্ধের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। অষ্ট মহানরক ও ষোড়শ 'উস্‌সদ' নরকের দারুণ দুঃখের কথা স্মরণ করুন।

পুনঃ পুনঃ বিভিন্ন জন্মে আমরা শ্মশানের অভিবৃদ্ধি সাধন করছি। উদর পোষণের জন্য কত না কুকর্ম সম্পাদন করেছি। এর প্রতিফলন ভোগ করতে হয়েছে ভীষণ দুঃখময়। দুঃখসত্য, সমুদয় সত্য, নিরোধ সত্য ও মার্গ সত্যের প্রতি মনোনিবেশ করুন।

চতুরঙ্গ আর্যসত্যরূপ অমৃতের বিদ্যমানে পঞ্চ কটুরস কেন পান করবেন? যা অন্বেষণে দুঃখ পরিগ্রহণে দুঃখ, আরক্ষায় দুঃখ, পরিভোগে দুঃখ এবং বিপাক ততোধিক দুঃখদায়ক, তৎপ্রতি কেন এত লালসাৎ

নৈর্বাণিক ধর্মামৃতের বিদ্যমানে পরিতাপবহুল কামাগ্নির প্রতি কেন তৃষিত? কামরতি বড় জ্বালাময়, ক্ষোভময় ও সন্তাপময়।

বৈরীহীন নৈষ্ক্রম্যের বিদ্যমানে শত্রুবহুল কামাসক্তিতে কী প্রয়োজন? রাজা, অগ্নি, জল, চৌর এবং অপ্রিয় উত্তরাধিকারী প্রভৃতি কামের বহুশত্রু। কাম-রাগের কারণে রাজরোষে পতিত হয়, রাজদণ্ডে দণ্ডিত হয়, অগ্নিতে দগ্ধ হয়, জলে মগ্ন হয়ে মৃত্যুবরণ করে, চোরের মত গোপন অভিসারে নিযুক্ত হয়, ব্যাভিচার-দোষে দুষ্ট হয় এবং অন্যায় প্রণয় হেতু অপ্রিয় উত্তরাধিকারীর উদ্ভব হয়, একটি রমণীর প্রতি বহুজন আসক্ত হয়ে পরস্পর পরস্পরের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। অতএব পরম সুখদায়ক অমৃত-নির্ঝর নির্বাণ বিদ্যমানে বধ-বন্ধনাদি সন্ত্রাসবহুল কামলালসায় কী প্রয়োজন? কামাসক্ত দুঃখে জর্জরিত হয়।

জ্বলন্ত তৃণোল্কা নিঃশেষ হবার সময় তা যদি নিক্ষেপ না ক'রে ধারণ করেই থাকে, নিশ্চয়ই সে দগ্ধ হয়। সেরূপ কামতৃষ্ণা যে ত্যাগ করে না, সেও দগ্ধ হয়। ক্ষণিকের কামসুখের জন্য বিপুল সুখকে ত্যাগ করবেন না। মৎস্যের বড়শি গ্রাসের মত বিনষ্ট হবেন না।

কামতৃষ্ণা দমন করুন, নচেৎ স্তম্ভে শৃঙ্খলাবদ্ধ কুকুর যেমন চতুর্দিকে ঘুরতে থাকে, তদ্রূপ আপনাকেও ভবচক্রে সুদীর্ঘকাল ঘুরতে হবে। ক্ষুধার্ত চণ্ডাল যেমন সম্মুখে কুকুর দেখলে হত্যা করে, সেরূপ কামতৃষ্ণাও আপনাকে বিনষ্ট করবে। কামানুরক্ত হয়ে আপনি অশেষ দুঃখ ও দৌর্মনস্য ভোগ করবেন। অধ্রুব কামতৃষ্ণাকে পরিত্যাগ করুন।

অজরত্ব বিদ্যমানে জরাশীল কামরতিতে কী প্রয়োজন? সকল জন্মেই বিদ্যমান রয়েছে জর-দুঃখ, ব্যাধি-দুঃখ ও মৃত্যু-দুঃখ। অজর-অমর অবস্থাই শোকহীন, শত্রুহীন ও বিঘ্নহীন। তা অচঞ্চল, ভয় ও সন্তাপহীন।

এ অমৃত বহুজনের অধিগত হয়েছে। যাদের হয়নি; তাদের অদ্যই লাভ করা উচিত। যিনি একাগ্রতার সহিত নিজেকে নিয়োজিত করেন, তিনিই লাভ করে থাকেন। অন্যথায় ইহা প্রাপ্য নয়। অনুমাত্রও সংস্কার প্রবর্তিত হলে, দুঃখ ব্যতীত সুখ নেই।" এ বলে সুমেধা রাজা অনিকরত্তের চেতনা উৎপাদনের জন্য তাঁর কর্তিত কেশ রাজার সম্মুখে

ভূমিতলে নিক্ষেপ করলেন। তখন অনিকরত্ত দাঁড়িয়ে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে নৃপতি কোঞ্চকে বললেন– "মুক্তি ও সত্যদর্শন উদ্দেশ্যে প্রব্রজ্যা গ্রহণের জন্য সুমেধাকে অনুমতি প্রদান করুন।"

জাগতিক দুঃখভয়ে ভীতা রাজসুতা সুমেধা মাতাপিতার অনুমতি পেয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন এবং আধ্যাত্মিক ধ্যানে অভিনিবিষ্ট হয়ে অচিরে ষড়ভিজ্ঞা সহ অর্হত্বফল সাক্ষাৎ করলেন।

পূর্বজন্ম

সুমেধার পূর্বজন্ম বড় বৈচিত্রময় ও সমুজ্জ্বল। তিনি পূর্ববুদ্ধগণের সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন এবং বুদ্ধ শাসনে বিবিধ প্রকার কুশল কর্ম সম্পাদন করে নিজকে পূর্ণসুষমায় মন্ডিত করেছিলেন। এতেই সুগম হয়েছিল তাঁর মুক্তির পথ। তাঁর বড় সৌভাগ্য যে, পরম পুণ্যক্ষেত্র কোণাগমন বুদ্ধের সময় তিনি জন্ম নিয়েছিলেন এক সম্ভ্রান্ত বংশে। জন্মান্তরে উপচিত কুশল সংস্কারের প্রভাবে রত্নত্রয়ের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা স্বতঃই বিকাশ লাভ করে তাঁর পুণ্যপূত অন্তরে। বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘের প্রতি তাঁর অপরিসীম মমতা। প্রতিদিন বিহারে গিয়ে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘের দর্শন ও ধর্মশ্রবণ তাঁর জীবনের অন্যতম ব্রত। দানে তাঁর অপার আনন্দ, অধিকন্তু শীল পালনে শুচি-শুভ্র জীবন গঠনের প্রতি তাঁর প্রবল আগ্রহ।

একদিন তিনি ধর্মসভায় হৃদয়গ্রাহী ভাষণ শুনলেন। শুনলেন বিহারদানের উপকারিতা, প্রয়োজনীয়তা এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সুখদায়ক ফল লাভের কথা। তাঁর অন্তর উদ্বুদ্ধ হল এবং বিহারদানের প্রবল ইচ্ছা জাগ্রত হল। তাঁর দু'জন সখী-সহচরী ধনাঢ্য কুলের রমণী ক্ষেমা ও ধনঞ্জনী। তাঁদের নিকট তার অন্তরের কথা ব্যক্ত করলেন। তাঁর কথা সখীদ্বয় উৎফুল্ল অন্তরে অনুমোদন করলেন। রমণীত্রয়ের মানস-কুসুম একই সূত্রে গ্রথিত হল। একই মনোভাব, একই বাসনাময় পুণ্যপূত তিন মনের সংমিশ্রণে মহাশক্তির উদ্ভব হল। শ্রদ্ধাবতী নারীত্রয় এক যোগে সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণ মনোরম প্রকান্ড এক বিহার তৈরী করালেন। বিহারদানের অনুষ্ঠান অতি আড়ম্বরপূর্ণ হল। বুদ্ধপ্রমুখ আগত-অনাগত ভিক্ষুসংঘকে এ মহাবিহার দান করলেন।

কুলকন্যা ভাবী সুমেধা বিহারদানকে কেন্দ্র করে পূর্বচেতনা, মুঞ্চন চেতনা ও অপর চেতনায় মহপুণ্য অর্জন করেছিলেন। তজ্জন্য তাঁর আনন্দ ও সৌমনস্যভাব বর্ণনাতীত। এ উপায়ে তাঁর ভাবী জীবনকে এমন সমুজ্জ্বল ও আনন্দময় করে তুলেছিলেন যে, যা অনির্বচনীয় ও অচিন্ত্যনীয়। এ পুণ্যশ্লোকা নারীর মহাকুশলকর্ম চিত্তসম্পদ, ক্ষেত্র সম্পদ ও বস্তু সম্পদে এতই মহান্ ও প্রভাবশালী হয়েছিল যে, এতেই তিনি পরমায়ুর অবসানে দেহত্যাগের পর 'তাবতিংস' দেবলোকে দেবেন্দ্র পুরে উৎপন্ন হয়েছিলেন। তাঁর দিব্যকান্তি, দিব্যরূপ ও দিব্যজ্যোতিতে দেবরাজের দিব্যবিমান উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল এবং তত্রস্থ দেববালাদের অভিভব করে তিনি বিরোচিত হয়েছিলেন।

দেবরাজ ইন্দ্র নবাবির্ভূতা জ্যোতির্ময়ী দেবকন্যাকে দর্শন করেই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন বিস্ময় কণ্ঠে- "অনুমোদর্শনে দেবতে, তুমি কোথা হতে এসে আমার ভবন অপরূপ জ্যোতিতে আলোচিত করে বিরোচিত হচ্ছে? আমার এ বিমান সুরুচিপূর্ণ জ্যোতিরত্নময়। এমন মনোরম দিব্যাবিমান প্রাদুর্ভূত হয়েছে একমাত্র আমারই পুণ্যপ্রভাবে। দিব্য-ঐশ্বর্যে দীপ্যমান এ বৈচিত্র্যময় বিমানে শত সহস্র জ্যোতিস্মতী পুণ্যময়ী দেববালা উৎপন্ন হয়ে আমার মনোরঞ্জন করছে। কিন্তু দেবী, তুমি এসব দেবকন্যাদেরও অভিভব করে শোভা পাচ্ছ! চন্দ্রমাঃ যেমন তারকারাজি পরাজয় করে বিরোচিত হয়, সেরূপ তুমিও এ অভিরূপা অপ্সরাদের পরাভব করে সুশোভিত হচ্ছ! তোমার শোভন-মোহন জ্যোতিষ্মানরূপের নিকট অপর দেববালাদের রূপ তিরস্কৃত হচ্ছে! মহব্রহ্মাকে দেখে তাবতিংসের দেবগণ যেরূপ আনন্দিত হয়, সেরূপ তোমাকে দেখেও সমস্ত দেবতা আনন্দানুভব করছে। অয়ি প্রিয়দর্শনা দেবী, তোমায় জিজ্ঞাসা করছি, কোন্ কুশল কর্ম সম্পাদন করে এরূপ যশস্বিনী হয়েছ?"

প্রশ্নোত্তরে দেবকন্যা মধুর কণ্ঠে বললেন- "দেবরাজ, আমি গতজন্মে ভগবান কোণাগমন বুদ্ধের উপাসিকা ছিলাম। এক সময় বিহারদানের বৈচিত্র্যময় ফলের কথা শুনে একখানা বিহারদানের তীব্র ইচ্ছা জাগ্রত হয়। অচিরে সে সুযোগ আমার জুটে গেল।

আমার দু'জন প্রিয় সখী ধনাঢ্য কুলের উদারচেতাঃ মহিলা এ শুভকাজে যোগদান করেছিল। যথাসময় একখানা সুদৃশ্য বড় বিহার নির্মাণ করে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে দান করেছিলাম এবং এতে আমি অনুপম আনন্দ উপভোগ করেছিলাম। দানের পূর্বে, দানের সময় ও দানের পর চিত্তের সুপ্রসন্ন ভাব বিরাজমান ছিল আমার অন্তিম নিশ্বাস পর্যন্ত। চিত্ত সম্পদ, বস্তু সম্পদ ও ক্ষেত্র সম্পদের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠতম ও সুবিশুদ্ধ হেতু পুণ্য উৎপন্ন হয়েছে বিপুল-অপ্রমাণ। এ বিরাট পুণ্যের ফলেই আজ আমি দেবরাজ পরিভোগ্য ঈদৃশ সুরম্য রত্নবিমানের অধিবাসিনী হয়েছি। আরো শুনুন, মানবকুলে আমি প্রতিদিন বিহারে গিয়ে প্রসন্ন মনে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘের দর্শন ও পূজা করতাম এবং বিবিধ খাদ্য-ভোজ্য দান করতাম। সারাজীবন পঞ্চশীল, উপোসথ দিবসে অষ্টাঙ্গ উপোসথশীল প্রতিপালন করেছিলাম। এ মহান্ পুণ্যপ্রভাবে স্বতঃই আমার দেহ হতে এরূপ মনোরম দিব্যজ্যোতিঃ নিঃসৃত হচ্ছে। আমি এখন সম্যকরূপে উপলব্ধি করছি; যাঁরা তাবতিংস দেবতাদের সঙ্গলাভ করবার ইচ্ছা করেন, তাঁদের বহুবিধ কুশলকর্ম সম্পাদন করা প্রয়োজন। পুণ্যবানই সর্ববিধ দিব্যসম্পদের অধিকারী হন। যারা পুণ্যার্জন করে না, তাদের জন্য এ দিব্যস্থান নয়। পুণ্যবানের জন্যই এই ত্রিদশালয়ের শোক-দুঃখ-হীন রমণীর দিব্যভবন ও দিব্যৈশ্বর্য। যারা কুশলকর্ম সম্পাদন করে না, তাদের সুখ-শান্তি ইহলোকেও নেই, পরলোকেও নেই। পুণ্যবানেরাই ইহ-পরকালে সুখী হন।"

দেবরাজ ইন্দ্র দেববালার এরূপ বাক্যাবলী শ্রবণে সন্তুষ্ট হয়ে বললেন– "অচিন্ত্যনীয় বুদ্ধ, নির্বাণপ্রদ ধর্ম ও অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র সংঘ, এ রত্নত্রয়ের প্রতি প্রসন্নমনা, প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও বিশুদ্ধ শীলসম্পন্না, অনাময়ী ও প্রিয়দর্শনা দেবতে, তুমি ধর্মযশে ও দিব্যযশে যশস্বিনী হয়ে বিরোচিত হচ্ছ। তোমার দ্বিবিধ সম্পদই আমি অনুমোদন করছি। এ দেবলোকে তুমি স্বাগতা।" এ বলে দেবরাজ এ পুণ্যশ্লোকা-মহীয়সী দেবকন্যাকে তাঁর প্রধানা মহিষীপদে বরণ করে পুণ্যের পুরস্কার স্বরূপ মহাগৌরব দান করলেন।

এ সৌভাগ্যবতী দেবকন্যা দেবরাজ্যের প্রিয়তমা পত্নী হয়ে অচিন্ত্যনীয় দিব্যৈশ্বর্যের অধিকারিণী হয়েছিলেন। এ আনন্দময় সুরপুরে তিনি দেববালাদের শ্রেষ্ঠ হয়ে পরম সুখে তিন কোটি, ষাট লক্ষ বৎসর অনুপম দিব্যসম্পদ ভোগ করে 'তাবতিংস' স্বর্গ হতে চ্যুত হয়ে 'যাম' দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছিলেন। তথায় 'সুকাম' নামক দেবরাজের প্রধানা মহিষী হয়ে ১৪ কোটি ৪০ লক্ষ বৎসর তাবতিংস স্বর্গ হতেও অধিকতর দিব্যসুখ ভোগ করেছিলেন।

'যাম' দেবলোকে সুদীর্ঘ আয়ুর অবসানে সেখান হতে চ্যুত হয়ে মনোরম সৌন্দর্যশ্রেষ্ঠ 'তুষিত' স্বর্গে উৎপন্ন হয়েছিলেন। তথায় 'সন্তোষিত' নামক দেবরাজের প্রধানা মহিষী হয়ে ৫৭ কোটি, ৬০ লক্ষ বৎসর অনুপম দিব্য-সম্পদ পরিভোগ করেছিলেন।

'তুষিত' স্বর্গ হতে পরমায়ুর অবসানে চ্যুত হয়ে 'নির্মাণরতি' দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছিলেন। তথায় 'সুনির্মিত' নামক দেবরাজের প্রধানা মহিষী হয়ে ২৩০ কোটি, ৪০ লক্ষ বৎসর অতুলনীয় দিব্যসুখ উপভোগ করেছিলেন।

'নির্মাণরতি' দেবলোক হতে পরমায়ুর অবসানে চ্যুত হয়ে 'পরনির্মিতবশবর্তী' দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছিলেন। তথায় 'বশবর্তী' নামক দেবরাজের প্রধানা মহিষী হয়ে ৯২১ কোটি, ৬০ লক্ষ বৎসর কামলোকের অদ্বিতীয় দিব্যসুখ পরিভোগ করে পরমায়ুর অবসানে সেখান হতে চ্যুত হয়ে মনুষ্যকুলে মহাধনাঢ্য ব্যক্তির কন্যা হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রখর জ্ঞান ও বিচার-বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর স্মৃতিশক্তিও প্রবল ছিল।

তখন জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন ভগবান কশ্যপ বুদ্ধ। একদা উক্ত ধনবানের কন্যা তথাগত বুদ্ধের বাণী শুনে রত্নত্রয়ের প্রতি অত্যধিক প্রসন্ন হন। বুদ্ধ ও ভিক্ষুগণকে দান করেন মুক্ত হস্তে, মমতাময় অন্তরে। সকল সময় সযত্নে শীল রক্ষা করেন। একাগ্রতার সাথে দেহের ৩২ প্রকার অশুচি সম্বন্ধে ভাবনা করেন। অনিত্য-দুঃখ- অনাত্ম এ ত্রিলক্ষণ জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য যত্নপর থাকেন। এরূপে দান- শীল-ভাবনাময় বিবিধ কুশল কর্মে নিরত হয়ে পরমায়ুর অবসানে দেহত্যাগের পর আবার 'তাবতিংস' স্বর্গে উৎপন্ন হন। মানবকুলে

সঞ্চিত পুণ্যের পুরস্কার স্বরূপ পুনঃ পুনঃ সপ্তকাম সুগতি লোকের এক এক ভুবনে জন্ম নিয়ে মহাসুখের অধিকারিণী হয়েছিলেন। তাঁর এ জন্মগ্রহণের ক্রমিক পর্যায় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও আশ্চর্যজনক।

যথা–একবার তিনি মনুষ্যলোকে জন্ম নিয়ে মৃত্যুর পর উপর্যুপরি দশবার দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছিলেন। পরে পুনরায় একবার মনুষ্যলোকে জন্ম নিয়ে পরমায়ুর অবসানে দেহত্যাগের পর উপর্যুপরি শতবার বা শতাধিকবার দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছিলেন। এরূপে একবার মনুষ্যলোকে আবার শতশত বার বা সহস্র সহস্র বার, কোন কোন সময় দশ সহস্রবার দেবলোকে জন্ম নিয়েছিলেন। দেবজন্মে তিনি দিব্যঋদ্ধি, দিব্যযশঃ, দিব্যরূপ, দিব্যজ্যোতি, দিব্যঐশ্বর্য ও দিব্যানুভাবে অন্যান্য দেবতাদের অভিভব করে বিরোচিত হয়েছিলেন। মানবকুলে মহাধনাঢ্যের কন্যা, রাজকন্যা, রাজমহিষী, রাজচক্রবর্তীর প্রধানা মহিষী, সপ্তরত্নের অন্যতম রত্ন স্ত্রীরত্ন হয়ে পরম সৌভাগ্যের অধিকারিণী হয়েছিলেন। ইহ-পর উভয়কালই তাঁর পক্ষে আনন্দময় ও মহাসুখময় হয়েছিল। এরূপ সৌভাগ্য লাভ জগতে বড়ই দুর্লভ। বিহারদান মহাপুণ্যের সঙ্গে সংযোগ হয়েছিল দান-শীল-ভাবনার মহাপুণ্য, মণি-কাঞ্চন সংযোগের মত।

এরপর জগতে আবির্ভূত হলেন শাক্যমুনি বুদ্ধ। এমন সুদুর্লভ শুভসময়ে উক্ত পুণ্যদীপ্তিমতী নারী দেবকুল হতে নেমে এলেন মন্তাবতী নগরীর নরাধিপ কোঞ্চের কন্যারূপে। এ রাজনন্দিনীই সেই সুমেধা। এ পুণ্যপ্রভাময়ী নারী যেন অমরাপুরী হতে দিব্যজ্যোতি-দিব্যরূপ স্বাধিকারভাবেই নিয়ে এসেছেন। রূপ-লাবণ্যের এমন উজ্জ্বলতা মানবের মধ্যে সম্ভব নয়। তাঁর সুন্দর দীপ্তচোখে প্রতিভার জ্যোতি বিকশিত। মুখে স্বয়ং সঞ্জাত শোভন মোহন প্রসন্নতায় ছাপ যেন লেগেই রয়েছে। জন্মান্তরের অপরিমেয় পুণ্য সংস্কারের প্রভাবে তাঁর শৈশবেই প্রতীয়মান হয়েছে সদ্ধর্মের প্রতি প্রাণের প্রগাঢ় আকর্ষণ। যার প্রভাবে তিনি ভোগ বিলাসের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়েছিলেন এবং বুদ্ধ শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে নির্বাণ সাক্ষাৎ করেছিলেন।

সুমেধার এ নির্বাণ সাক্ষাৎ বড়ই বিস্ময়কর। তিনি জাতিস্মর জ্ঞানের প্রভাবে পূর্ব জন্মের ইতিবৃত্ত জ্ঞাত হয়ে জগতের শিক্ষার জন্য তা প্রকাশ

করেছিলেন– "ভগবান কোণাগমন বুদ্ধের সময় আমি ও আমার দু'জন সখী ক্ষেমা ও ধনঞ্জনী একযোগে একখানা বৃহৎ সুরম্য বিহার নির্মাণ করিয়ে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে দান করেছিলাম। এর ফলে দেব-মনুষ্যলোকে যেরূপ অসাধারণ ও অচিন্ত্যনীয় সুখের অধিকারিণী হয়েছিলাম, এর একমাত্র হেতু হল বুদ্ধ শাসনে আত্ম সমর্পণ; তা'ই মূল, তা'ই উৎস। এ আত্মসমর্পণই প্রথম সংযোগ। এতেই আমি তৃষ্ণাক্ষয় করে সর্বোচ্চ সিদ্ধিলাভ করেছি। অনন্যসাধারণ প্রজ্ঞার অধিকারী ভগবান সম্যক্ সম্বুদ্ধের বচনে যাঁরা শ্রদ্ধাবান, তাঁরাই তৃষ্ণাক্ষয় করে নির্বাণ সাক্ষাৎ করেন।'

৭। ইসিদাসী

(১)

গঙ্গাসৈকতে সুখাসীনা দু'জন ভিক্ষুণী। উভয়েই যুবতী, যৌবন-সুষমায় সুরভিতা। উভয়েই জ্যোতির্ময়ী। সমুজ্জ্বল আনন, প্রসন্ন দৃষ্টি, সংযত বাক্যে, সুসংযত কায় ও মন, ভাবগম্ভীর মুখমন্ডল। তাঁদের দেখলে শ্রদ্ধার অন্তর আপ্লুত হয় মস্তক নত হয়ে পড়ে।

দিবা দ্বিপ্রহর। নির্জন-মনোরম স্থান। সম্মুখে তরতর-বাহিনী শৈলসুতা গঙ্গা। বসন্তের মৃদুমন্দ পবন হিল্লোল, পাদপ-নি কুসুম-সম্ভারে সুশোভিত, নিবিড় ছায়া-সেবিত বিটপীমূল, বিবেকপূর্ণ পরিবেশ।

একজন ইসিদাসী, অপর বোধি। তাঁদের মধ্যে খুব ভাব, পরস্পর পরস্পরের প্রতি মৈত্রীময় অন্তর। তাঁরা উভয়ে পাটলীপুত্র নগরে একসঙ্গে অন্নভিক্ষায় নিরত হয়েছিলেন। নদীসৈকতে বসে ভোজনকৃত্য সম্পন্ন করলেন, পান করলেন গঙ্গার স্বচ্ছ সুশীতল পরিস্রুত জল। তারপর নিবিড় ছায়াসম্পন্ন পাদপমুলে বিশ্রাম মানসে সমাসীন হলেন। ভিক্ষুণী বোধি ইসিদাসীকে দেখলেন অনন্য দৃষ্টিতে, সমুৎসুক মনে। বললেন স্মিত হাস্যে– "ইসিদাসী, তুমি এখন পূর্ণ যুবতী। তোমার কান্তিময় দেহে উচ্ছল হয়ে পড়েছে যৌবন লালিত্য। অভিরূপ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, কেমন সুন্দর মনোমোহন লক্ষণবতী তুমি! আমি জানতে চাই,

যুবতীর স্পৃহণীয় মদিরময় বিলাস-ব্যসনে কেন তুমি বীতশ্রদ্ধ হয়েছ? কেন হয়েছ কামিনী-কাম্য, সুখ-ভোগের প্রতি বিতরাগ? সংসারের কোন্ অবিচারে নিপীড়িত হয়ে বিরাগিণী বেশে গৃহত্যাগ করেছ? কেন তুমি প্রব্রজ্যার আশ্রয় নিয়েছ?

প্রত্যুত্তরে ইসিদাসী বললেন– "তবে শোন বোধি, আমার সে করুণ কাহিনী। উজ্জয়িনী নগরে আমার পিত্রালয়। পিতা আমার মহাধনশালী। তিনি সজ্জন ও ধর্মপরায়ণ। তাই তিনি "ধার্মিক শ্রেষ্ঠী" নামে সুপরিচিত। আমি মাতা-পিতার একমাত্র কন্যা। তাই তাঁদের আমি ছিলাম অতিপ্রিয় ও আনন্দদায়িনী।

আমার পরিণত বয়সে সাকেত নগর হতে আমার বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত হয়েছিল। বর বংশমর্যাদা সম্পন্ন ধনবান শ্রেষ্ঠীর সময় মহা আড়ম্বরের সাথে বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল। আমি ধনবান শ্রেষ্ঠীর পুত্র। সমজাতি ও সম অবস্থা দর্শনে পিতা সম্মত হলেন। যথা সময় মহা-আড়ম্বরের সহিত বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল। আমি ধনবান শ্রেষ্ঠীর পুত্রবধূ হলাম। স্বভাবতই আমি ছিলাম ভদ্র-বিনীত। শ্বশুর কুলের গৌরব রক্ষার ও রীতি-নীতি প্রতিপালনের প্রতি খুব যত্নবান ছিলাম। প্রাতঃ সন্ধ্যা শ্বশুর-শাশুড়ীকে প্রণাম করে তাঁদের পদধূলি মস্তকে ধারণ করতাম। স্বামীর ভগ্নী, ভ্রাতা ও পরিজনবর্গের যে কাউকেও দেখলে শশব্যস্তে আসন প্রদান করতাম। অন্ন-পানীয়, খাদ্য-ভোজ্য ইত্যাদি সমভোগে পরিবেশন করে তাদের সুখী করতাম।

সকলের পূর্বেই শয্যাত্যাগ করে সম্মার্জন ও প্রাতঃকৃত্য সম্পাদনের পর কৃতাঞ্জলি হয়ে স্বামীর নিকট গমন করতাম এবং চিরুনি, দর্পণ, মুখবিলেপন, অঞ্জন ইত্যাদি প্রসাধনী নিয়ে সুবিনীতা পরিচারিকার মত স্বীয় হস্তে স্বামীকে বিভূষিত করতাম।

সহস্তে রন্ধন কার্য শেষ করে পাত্রাদি ধৌত করতাম, মাতার একমাত্র পুত্রের ন্যায় মমতাময় অন্তরে স্বামীর–সেবা-যত্ন করতাম স্বামীভক্তিপরায়ণা ও স্বামীগতপ্রাণা হয়ে সর্বক্ষণ স্বামীর সন্তোষ বিধানে তৎপর থাকতাম, তবুও স্বামী আমার প্রতি বিমুখ হলেন।

আমার ন্যায় অনুপমা সেবিকা, নিরভিমানা, প্রত্যূষে সর্বাগ্রে শয্যাত্যাগশীলা, পতিগতপ্রাণা, অনলসা, ধর্মশীলা, স্বামীর হিতৈষিণী পত্নী স্বামীর অসহ্য।

তিনি জনক-জননীকে বললেন– "আমি গৃহত্যাগী হব। আপনারা আমায় অনুমতি দেন, আমি সংসার ছেড়ে চলে যাই।"

মাতা-পিতা ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন– "কেন পুত্র, গৃহত্যাগ করবে কেন?" তিনি বললেন– "ইসিদাসী আমার অসহ্য হয়েছে।"

মাতা-পিতা ব্যস্ত হয়ে বললেন– "পুত্র, এমন কথা বলো না। ইসিদাসী বিদুষী, বুদ্ধিমতী, গুণবতী, অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ-শীলা, নিরলসা। তার প্রতি কেন বিরক্ত হলে? সে কি কোন ও অনিষ্ট করেছে"?

তিনি স্থির কণ্ঠে বললেন– "সে অনিষ্ট না করলেও, আমার পক্ষে অসহ্য হয়েছে। সে গুণবতী হলেও, তার সঙ্গে বাস করতে পারবো না।"

তাঁর মাতা-পিতা উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন– "পুত্র, এমন বলো না। সে নির্দোষ হলে, তোমার অসহ্য হবার কারণ কি? তোমার কি মস্তিস্ক বিকৃতি ঘটেছে? এরূপ গুণশীলা মেয়ে পাওয়া দুষ্কর। এমন নির্দোষ লক্ষ্মীস্বরূপা বধূমাতাকে আমরা ত্যাগ করতে পারবো না।"

স্বামী রুষ্ট হয়ে বললেন– "তাঁকে তো ত্যাগ করতে বলছি না; বলছি, আমিই গৃহত্যাগী হবো। একে নিয়ে আপনারা সুখে থাকুন।"

শাশুড়ী বিমর্ষ হয়ে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন– "তুমি কি কোনো অপরাধ করেছো? নিঃসঙ্কোচে সত্য বল।"

আমি বাষ্পাকুল কণ্ঠে বললাম– "মা, আমি কোনও অপরাধ করিনি, কোন অনিষ্টও করিনি, কোনদিন কোন কটুকথাও বলিনি, তিনি কেন বিরূপ হয়েছেন তাও জানি না। দাসীর মত সেবা করেছি, পরিচর্যা করেছি। তাঁর সন্তোষ বিধানের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছি, প্রাণাধিক ভালবেসেছি। তবুও যদি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হন, আমার দুর্ভাগ্যই বলতে হবে।"

শ্বশুর-শাশুড়ী মর্মান্তিক দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়লেন, তথা শ্বশুর-কুলের সবাই। তখন আমি দুঃখে-ক্ষোভে-অপমানে রোদন করতে লাগলেন। পুত্র গৃহত্যাগী হবেন মনে করে তাঁরা ভীত হয়ে পড়লেন। আমার জন্য কি তাঁরা পুত্র হারাবেন? শ্বশুর সজল নয়নে আমায় বললেন– "বৌমা, আমাদের কপাল মন্দ, ছেলের মতিগতি কেন এরূপ হল কিছুই বুঝলাম না। কি করবো, তোমায় বিদায় দেবার আমার মোটেই ইচ্ছা নেই তবুও বিদায় দিতে হচ্ছে। তুমি প্রস্তুত হও, আমি গিয়ে দিয়ে আসবো।" শ্বশুরের আদেশ পেয়ে আমি প্রস্তুত হলাম। শাশুড়ী আমার সর্বালঙ্কারে বিভূষিত করবার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু, আমি রাজী হলাম না। বললাম– "এতে আমার সুখের যাওয়া নয় মা।" শাশুড়ীর পায়ের উপর মস্তক রেখে প্রণাম করলাম। শাশুড়ী আমাকে বুকে চেপে ধরে বহু ক্রন্দন করলেন। তারপর শ্বশুরালয়ের সকলের নিকট বিদায় নিয়ে শ্বশুরের সঙ্গে পিত্রালয় অভিমুখে রওনা হলাম। পিতৃভবনে উপনীত হলে শ্বশুর পিতাকে সকল কথা বললেন। আরো বললেন "আজ হতে আমরা লক্ষ্মীহীন হলাম।" শ্বশুর সজল নেত্রে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। বলা বাহুল্য, তিনি আমার পিতাকে আমার সমস্ত অলঙ্কার ও বহু অর্থ দিয়ে গেলেন, আমার পিতার অনিচ্ছা সত্ত্বেও।

পিতা খুব মর্মবেদনা অনুভব করলেন। কিন্তু, তা বহিপ্রকাশ হল না, অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত। তিনি আমাকে বহু উপদেশ ও আশ্বাস-বাণী শোনালেন। তবুও কিন্তু, আমার অন্তরে সকল সময় একটা প্রশ্ন জেগে উঠত– "কেন এরূপ হল? নির্দোষ-সেবা-পরায়ণা হয়েও স্বামীর অসহ্য ও অবজ্ঞার পাত্রী হলাম কেন?" এ প্রশ্নের সমাধান তখন আমি করতে পারি নি। অবিদ্যার ঘনান্ধকারে তা আবৃত্ত ছিল।"

আমার পিতা পুনরায় আমাকে পাত্রস্থ করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁর প্রয়াস সফল হল। আমার ভূতপূর্ব শ্বশুর প্রদত্ত অর্থের অর্ধ পরিমাণ ব্যয় করে দ্বিতিয়বার এক ধনবানের পুত্রের সাথে আমার বিবাহ দিলেন। মাত্র একমাস সেখানে অবস্থান করার পর সেখান হতেও বহিস্কৃত হলাম। অথচ আমি ছিলাম নির্দোষ ও শীলবতী। ক্রীতদাসীর মত স্বামীসেবায় নিরত ছিলাম। তবুও এরূপ মন্দভাগ্য

আমার। অভাগা যেদিকে চায়, সাগর শুকিয়ে যায়। আমি যেদিকে চাই, সেদিকই শুকিয়ে যায়; যে ডাল ধরি, সে ডালই ভেঙ্গে যায়। এরূপ দুর্ভোগ যে, কোন্ দারুণ পাপের ফল, তখন তা অজ্ঞাত ছিলাম। আমার দুর্ভাগ্য-জীবন দুর্বহ হয়ে উঠল।

এমন সময় দ্বারে দ্বারে ভিক্ষায় রত এক সন্ন্যাসীকে দেখে পিতা তাঁকে বললেন-- "তোমার চীবরবাস ও ভিক্ষা পাত্র ত্যাগ করে আমার গৃহে অবস্থান কর এবং আমার জামাতা হও।" বাবার কথায় সন্ন্যাসী সম্মত হলেন। তৃতীয়বার আমার বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল। পবিত্র সন্ন্যাসধর্ম ত্যাগ করে তিনি আমায় পত্নীরূপে বরণ করে নিলেন। আমি সুখী ও কৃতার্থ হলাম এবং নতুন স্বামীর চিত্ত বিনোদনের জন্য যত্নপর হলাম। দেখ বোধি, সংসার কেমন বৈচিত্রময়? কামিনীর কামনা চরিতার্থের জন্য সন্ন্যাসীকেও স্বামীরূপে পেতে ইচ্ছা করে, পেলে সুখী হয়, কৃতার্থ হয়! আমি ছিলাম এমন দুরাশায় নারী। এমন দুরদৃষ্ট আমার। মাত্র এক পক্ষ কালের পর আমার অজ্ঞাত নিগূঢ় কর্মের তাড়নায় ইনিও বিরূপ হলেন, আমার সংসর্গ তার অসহ্য হল। তিনি বিতৃষ্ণা মনে পিতাকে বললেন-- "শ্রেষ্ঠীপ্রবর, আমার ছিন্নবস্ত্র ও ভিক্ষাপাত্র ফিরিয়ে দিন, আমার ভিক্ষাবৃত্তিই শ্রেয়ঃ।"

হঠাৎ তাঁর একথা শুনে মাতা-পিতা বিমর্ষ হলেন। মাতা ও জ্ঞাতিবর্গ আমাদের ধন-সম্পদ ও সুখ-ভোগের কথা বলে তাঁকে প্রলোভিত করার প্রয়াস পেলেন। কিন্তু, তিনি সব কিছুতেই উপেক্ষা ও বিতৃষ্ণা প্রকাশ করলেন। অগত্যা-মাতা তাঁকে বললেন-- "এ সুরম্য প্রাসাদ এবং আমাদের যা সম্পদ সমস্তই তোমার, তুমিই হবে এর সর্বেসর্বা, যেহেতু আমাদের একমাত্র সন্তান ইসিদাসী। তাই বলছি, তুমি এখানে অবস্থান কর।"

তিনি বিরক্তির স্বরে বললেন-- "আমি সম্পদ চাই না, অট্টালিকা চাই না, আমি চাই বৃক্ষমূল, চাই নির্জন পর্ণকুটীর।"

মাতা অধীর হয়ে বললেন-- "এখানে অবস্থান তোমার অপ্রিয় হচ্ছে কেন? আমরা কি করলে তুমি সুখী হবে, তা বল।"

তিনি নিস্পৃহ বাক্যে বললেন– "আমি একাকী অবস্থানেই তৃপ্ত। ইসিদাসীর সংসর্গে আমি থাকতে চাই না। আমার সেই ছিন্নবস্ত্র ও ভিক্ষাপাত্রটি ফিরিয়ে দিন, আমি চলে যাই।"

মা বললেন– "সে কোন অপরাধ করেনি বটে, কিন্তু আমার মন বলছে– ত্যাগই শান্তি।"

আমি পায়ে পড়ে কাতর অনুরোধ করলাম, কত রোদন করলাম, বললাম কেঁদে কেঁদে– "আমি আপনার চরণ সেবিকা, দাসী; আমায় ত্যাগ করে যাবেন না। আপনার বিরহ ব্যথা আমার অসহ্য হবে, বক্ষ বিদীর্ণ হবে, আপনি যাবেন না।" তবুও তিনি চলে গেলেন, আমার কোনও কথা শুনলেন না, আমার প্রতি দৃক্‌পাতও করলেন না, তাঁর ছিন্নবস্ত্র ও ভিক্ষাপাত্র নিয়ে চলে গেলেন।

তখন চিন্তা করলাম– "আমি বড় মন্দভাগিনী। আমার জন্য মাতা-পিতা ক্ষোভে-দুঃখে অপমানে ম্রিয়মান। জ্ঞাতিবর্গও কত মর্মপীড়া ভোগ করছেন। আমার এ উপেক্ষিত-লাঞ্ছিত ঘৃণ্য-জীবনের কি প্রয়োজন? আমি আত্মাঘাতিনী হোব, উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করবো।"

আবার চিন্তা কররাম– "আত্মহত্যা মহাপাপ, ইহা শাস্ত্রোক্ত কথা।" একাকিনী নিরালায় বসে এসব চিন্তা করছি। এমন সময় আর্যা জিনদত্তা ভিক্ষুণী, যিনি বিশুদ্ধ শীলগুণসম্পন্না, বহুশ্রুতা, তৃষ্ণাহীনা, অর্হৎ তাঁর শুভাগমন হল আমাদের গৃহে। তাঁকে দেখে আমি প্রসন্ন হলাম এবং আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করলাম। সত্বর সযত্নে আসন পেতে বসবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করলাম। তিনি উপবেশন করলে বন্দনা করার পর অন্ন-পানাদি আহার্য দ্রব্য পরিবেশন করে তাঁকে পরিতৃপ্ত করলাম।

আর্যা জিনদত্তাকে দেখে আমার অভিশপ্ত জীবনকে উৎকর্ষে পর্যবসিত করবার শ্রেষ্ঠ, ঋজু, উত্তম ও সুন্দর পথের ইঙ্গিত পেলাম। তখন সরাসরি চিত্তে উদয় হল– "ভগবান বুদ্ধের পবিত্রশাসনে আমি প্রব্রজ্যার আশ্রয় নেবো। তাই কল্যাণকর ও দুঃখমুক্তির শ্রেষ্ঠতম উপায়।" অন্ধকারে যেন দীপ্ত আলোকের সন্ধান পেলাম। আমার অন্তরে যে কিরূপ প্রীতির সঞ্চার হয়েছিল তা অবর্ণনীয়। তখন আমার

মনোদুঃখ ও গ্লানি সবই মুছে গেল। জিনদত্তাকে বললাম– "আর্যে, আমি বুদ্ধশাসনে আত্মোৎসর্গ করতে চাই। আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবো।

জিনদত্তা আমাকে উৎসাহিত করলেন। বললেন– "ইসিদাসী, তা অতি উত্তম। ইহাই দুঃখমুক্তির শ্রেষ্ঠতম অয়ন।"

পিতা একথা শুনে আমায় বললেন– "কন্যা, প্রব্রজ্যা ধর্ম শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র বটে, কিন্তু বড় কঠিন, বড় দুষ্কর। তুমি সুকোমল। এত কষ্ট তোমার সহ্য হবে না। তুমি ঘরে বসে বসে ধর্মাচরণ কর, যথেচ্ছা দান কর, শীল পালন কর।"

পিতার কথা শুনে সন্দেহ হল– "ইনি কি আমার মুক্তিপথের অন্তরায় হবেন? তখন আমি শঙ্কিত ও মনোদুঃখে কেঁদে উঠে কৃতাঞ্জলি হয়ে বললাম– "বাবা, বাধা দেবেন না, আমার মুক্তি পথের সহায় হউন। স্বকৃত পাপের ক্ষালন করতে হবে, আমায় যেতে দিন। সত্যধর্মের আশ্রয় নিয়ে নির্জনে সাধনায় ব্রতী হব। অন্যথায় মৃত্যু আলিঙ্গন করে এ অভিশপ্ত জীবনের অবসান ঘটাবো।"

আমার দৃঢ় সংকল্প দেখে পিতা ক্ষান্ত হলেন। সংবিঘ্ন অন্তরে তিনি বললেন– "প্রাণাধিক কন্যা, যাও প্রজ্ঞার অধিকারী হও। শ্রেষ্ঠতম ধর্মে আত্মনিয়োগ করে শান্তিময় নির্বাণ সাক্ষাৎ কর। মহামানব বুদ্ধ সেই পরমপদ সম্প্রাপ্ত হয়েছেন।"

সে দিনই মাতা-পিতা ও জ্ঞাতিদের নিকট বিদায় নিয়ে আর্যা জিনদত্তার অনুকম্পায় বুদ্ধশাসনে প্রব্রজ্যা ধর্মে দীক্ষা লাভ করলাম। অতঃপর জন্ম নিরোধক আধ্যাত্মিক গভীর সাধনায় নিজকে নিয়োজিত করলাম। চতুরার্যসত্য ও আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ সাধনার মাধ্যমে অনিত্য দুঃখ-অনাত্মের নিগূঢ় তত্ত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করে সপ্তাহের মধ্যেই জাতিস্মর জ্ঞান, চ্যুতি-উৎপত্তি জ্ঞান ও তৃষ্ণাক্ষয় জ্ঞান, এ গরিষ্ঠ গুণযুক্ত ত্রিবিদ্যা সহ অর্হত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পরাশান্তির উৎস অমৃত-নির্ঝর নির্বাণ সাক্ষাৎ করলাম। জাগতিক আত্যন্তিক দুঃখের আকর জন্ম-মৃত্যু রুদ্ধ হয়ে গেল। তখন অনুপম প্রীতিরসে আমার সর্বশরীর স্নাত হল। আমি হলাম শান্ত বিমুক্ত।

তারপর আমার জন্মান্তরের নিগূঢ় রহস্যের দ্বার উদ্‌ঘাটন করতে প্রবৃত্ত হলাম। আমার অভিশপ্ত অবজ্ঞাত জীবনের উৎস কোথায়, কোন্ অপকর্মের প্রভাবে এত দুঃখ, এত মর্মপীড়ায় জর্জরিত হলাম, তা উপধারণে মনোযোগী হলাম। একে একে অতীত সপ্ত জন্মের ইতিবৃত্ত আমার দিব্যদৃষ্টির গোচরীভূত হল। প্রীতিভাজন বোধি, সে অসহ দুঃখময় করুণ কাহিনী প্রকাশ করছি, মনোযোগ দিয়ে শোন।

১। অতীত একজন্মে এরককচ্ছ নামক নগরে আমি প্রসিদ্ধ এক ধনশালী সুবর্ণকার ছিলাম। যৌবনে মদে মত্ত হয়ে ধনবিতরণে বশীভূত করে পরস্ত্রীতে রত হয়েছিলাম। এ ব্যভিচার পাপে নিজকে সানন্দে আহুতি দিয়েছিলাম। এর পরিণাম ফল কখনও চিন্তা করি নি।

২। সে জন্মের অবসানে নরকে উৎপন্ন হয়ে ভীষণ দুঃখ ভোগ করেছিলাম। উঃ, সে কী দুঃসহ দুঃখ। পরদার লঙ্ঘনের এমন দারুণ বিষময় ফল সুদীর্ঘকাল ভোগ করেছিলাম।

৩। বহু দীর্ঘদিন পরে এ মহাদুঃখের অবসান হলে নরক হতে মুক্ত হয়ে কর্মের তাড়নায় মহাবনে বানরীর গর্ভে জন্ম নিয়েছিলাম। জন্মের সপ্তম দিবসে নিষ্ঠুর বানর যূথপতি তীক্ষ্ণ দন্তের দংশনে আমার অন্ডচ্ছেদ করেছিল। আহা, সে-কী দুঃখ, অসহ্য যন্ত্রণায় সংজ্ঞাহারা হয়েছিলাম। আমার কাতর চীৎকারে মাতা শোকাকুলা হয়েছিল। নির্দোষ-নিরীহ শিশু, তবুও অন্ডচ্ছেদ হলো। পরদার লঙ্ঘনের এমনি দারুণ দন্ড।

৪। বানর জন্মের অবসানে মৃত্যুর পর সিন্ধু প্রদেশে এক অরণ্যে কাণা ও খঞ্জ এক ছাগীর গর্ভে জন্ম নিয়েছিলাম। মালিক আমায় শৈশবেই মুস্কচ্ছেদ করে দিয়েছিল। উঃ, সে কী যন্ত্রণা। কম্পিতদেহে মা মা বলে কতই না রোদন করেছিলাম। পরদার লঙ্ঘনের কী দারুণ দন্ড! তারপর সারাজীবন আমার পৃষ্ঠোপরি প্রভুপুত্রদের বহন করতে হয়েছিল। সহ্য করতে হয়েছিল কত বেত্রাঘাত-পদাঘাত। তারপর মাংসলোলুপদের রসনাতৃপ্তির জন্য ঘটলো আমার অকাল মৃত্যু।

৫। এ অপঘাত মৃত্যুতেই দুঃখপূর্ণ ছাগজন্ম হতে মুক্ত হলাম বটে, কিন্তু কর্ম-নিবন্ধনে আবার পশুকুলে গো-ব্যবসায়ীর গাভীর গর্ভে জন্ম নিলাম। আমার দেহ ছিল সুন্দর লাক্ষারক্তবর্ণ। কর্মের তীব্র তাড়নায়

এখানেও আমার অন্ডচ্ছেদ হয়েছিল। ক্রমে বলীবর্দে পরিণত হলাম। দেহ হল সুন্দর, হৃষ্ট-পুষ্ট-বলিষ্ট। মালিকের প্রিয় হলাম বটে, কিন্তু আমায় নিযুক্ত করল লাঙ্গল ও শকট বহনে। যতদিন দেহে শক্তি ছিল ততদিন এ দুঃখের মধ্য দিয়েই অতিবাহিত হল। যখন দুর্বল হয়ে পড়লাম তখন অন্ধ হয়ে ম্রিয়মান হয়ে পড়লাম। ততোধিক দুঃখ হল মক্ষিকা মশক ও দংশকের দংশনে। তীব্র শীতে, প্রখর গ্রীষ্মে ও মুষলধারা বৃষ্টিতে কত যে দুঃখ পেয়েছি তা অবর্ণনীয়। পরদার লঙ্ঘনের এমন দুঃখপূর্ণ বিপাক ভোগ করেছিলাম।

৬। গো-জন্মের অবসানে মানবকুলে গৃহহীনা ক্রীতদাসীর গর্ভে জন্ম নিয়েছিলাম। ক্রীতদাসীর সন্তান, তদুপরি হয়েছিলাম নপুংসক। আহা, নারীও নয়, পুরুষও নয়। কুকর্মের কী অলঙ্ঘ্য বিধান! অসহ্য রিপুর তাড়না! উঃ সে কী অসহ দুঃখ। ত্রিংশতি বৎসর ব্যাপী অহোরাত্র উগ্রতেজোময় কামাগ্নিতে দগ্ধ হয়ে দুঃসহ যন্ত্রণায় অতৃপ্ত কামনা নিয়ে অকালে মৃত্যু আলিঙ্গন করেছিলাম। পরদার লঙ্ঘনের কী দারুণ দন্ড!

৭। নপুংসক দেহের অবসানে জন্ম নিলাম নিরতিশয় দরিদ্র, বহুঋণগ্রস্ত জনৈক শকট চালকের কন্যারূপে। ঋণ পরিশোধের জন্য পিতা এক বণিক হতে অর্থ গ্রহণ করে তৎবিনিময়ে আমায় প্রদান করলেন তাকে। আমি রোদন ও বিলাপ করতে করতে পিতৃগৃহ হতে চিরতরে বিচ্ছিন্ন হলাম। আমার যৌবন কালে বণিকের পুত্র গিরিদাস আমাকে স্ত্রীরূপে বরণ করেন। তাঁর অপর এক পত্নী ছিল। সে ছিল পতিগতপ্রাণা, শীলবতী ও যশোবতী। সপত্নী-ঈর্ষায় আমার অন্তর রাত্রি-দিন দগ্ধ হয়েছিল।

৮। তারপর হল আমার এ বর্তমান জন্ম। ইহজন্মে দাসীর ন্যায় যাদের সেবা করেছি, তাদের আমি অসহ্য হয়েছি। তারাই আমাকে ঘৃণা ও উপেক্ষা করেছে। এর কারণ আমি ইতিপূর্বে অজ্ঞাত ছিলাম। ইহা যে পরদার লঙ্ঘনের প্রতিফল তা এখন সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত হয়েছি। এক্ষণে আমি যে কর্মের বিপাকে অতিক্রম করেছি। তৎসঙ্গে জাগতিক সকল দুঃখেরও নিরসন করেছি। এখন আমি বিমুক্ত।"

ভিক্ষুণী বোধি প্রফুল্ল বদনে বললেন– "নির্বাণ প্রত্যক্ষকারিণী ইসিদাসী, তজ্জন্য তোমায় অভিনন্দন জানাচ্ছি।"

৮। শুভা

(১)

"পথ ছাড়ো।"

"তা হবে না, পথ ছাড়তে পারবো না।"

"কেন, আমি কি অপরাধ করেছি যে, তুমি আমার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালে?"

"সুলোচনে, তোমায় দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি, আসক্ত হয়ে পড়েছি, আমার তীব্র লালসার সৃষ্টি হয়েছে। এসো, আমার নিকট এসো।" এ বলে যুবক হস্ত প্রসারিত করে অগ্রসর হল।

তরুণী শাণিত-দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কঠোর কণ্ঠে বললেন– "সাবধান, এদিকে এসো না; আমায় স্পর্শ করবে না। আমি বিশুদ্ধ দেহ, নির্মল চিত্ত। কেন আমার পথ রোধ করছ? তুমি কলুষিত চিত্ত, আমি পবিত্র, তুমি রাগদুষ্ট-আমি বিরাগচিত্ত; কি হেতু আমার পথে বিঘ্নের সৃষ্টি করছ?

"তুমি সুন্দরী, তরুণী, পূর্ণ যুবতী, এ বেশে কি তোমায় শোভা পায়? প্রব্রজ্যার কি প্রয়োজন? এতে কি লাভ? কাষায় বস্ত্র দূরে নিক্ষেপ কর। এসো, চলো ওই মনোরম পুষ্প-শোভিত উপবনে প্রমোদে রত হই।

বিচিত্র কুসুম-সম্ভারে সুশোভিত, পুষ্পের আকুল করামধুর গন্ধে দিগন্ত আমোদিত। বসন্তের প্রাণ জুড়ানো মলয়-মারুত, কোকিলের সুধাঝরা কণ্ঠে মুখরিত পুষ্পিত উপবন কত মনোরম। এসো, ওই রমণীয় নিকুঞ্জে আমরা আমোদিত হই।

ওই শোন বায়ু-কম্পিত পাদপের মর্মর-ধ্বনি, এ বনে একাকী কিরূপে তৃপ্ত হবে? হিংস্র জন্তু, বিষধর সর্প সমাকুল জনহীন ভয়ানক মহাবনে একাকী আর অগ্রসর হয়ো না।

সুবর্ণপ্রতিমাসম অনিন্দ্য সুন্দরী তুমি, নন্দনকাননে অপ্সরার মত অনুপমা। কাশীর সর্বোত্তম সুন্দর সূক্ষ্ম বস্ত্র তোমার বরাঙ্গে শোভা পাবে। কিন্নরীর মত তুমি সুলোচনা। তোমার চেয়ে প্রিয়তর বস্তু এজগতে আমার আর অন্য কিছুই নেই। এ বনভূমিতে তোমার সেবায় আমি নিযুক্ত থাকবো।

আমার কথা শোন, "আমার প্রাসাদে পরিচারিকাবেষ্টিত হয়ে, কাশীর সূক্ষ্ম রেশমী বস্ত্র পরিধান করে, সুবাসিত কুসুমমাল্যে ও অঙ্গ বিলেপনে সুশোভিত হয়ে সুখে অবস্থান কর। মণি-মুক্তা খচিত বহুমূল্য অলঙ্কারে তোমায় সাজিয়ে রাখবো। সুকোমল শুভ্র-বসনাস্তৃত নবনির্মিত রেশমী তূলাময়ী শয্যা হবে তোমার; চন্দন ও পুষ্পসার সুবাসিত মহার্ঘ শয্যায় করবে সুখ শয়ন।"

"যুবক, যে দেহ দেখে তুমি বিমুগ্ধ হচ্ছো সে দেহ ঘৃণ্য অশুচিপূর্ণ, ক্ষণভঙ্গুর! এ দেহে গ্রহণযোগ্য এমন কি আছে, যা দেখে তুমি এরূপ বলছ?

"অয়ি সুন্দরী, তুমি মৃগীনয়না নারী, পর্বতান্তরের কিন্নরীলোচনা সদৃশ তুমি মদিরাক্ষী। আকর্ণ বিশ্রান্ত করা এমন সুন্দর চোখ আমার চোখে পড়েনি, যা অপূর্ব, যা রহস্যময়, যার আকর্ষণ অজেয়। তোমার ওই লোভনীয় জ্যোতির্ময় আঁখি যুগল আমার অতৃপ্ত পিপাসাকে উদ্দীপ্ত করে তুলছে।

অয়ি রক্তোৎপলগর্ভে, কেশররাজী যেমন শোভা পায়, সেরূপ সুন্দর আঁখিরোম শোভমান তোমার স্নিগ্ধ-মসৃণ স্বর্ণোজ্জ্বল বদনে শোভন মোহন নয়ন যুগল দর্শনে আমার অতৃপ্ত লালসা উদ্দীপিত হয়ে উঠেছে।

অয়ি কিন্নরীমন্দলোচনে, তুমি আমার চোখের অন্তরালে দূরে অবস্থান করলে তোমায় ভুলতে পারবো না, তোমার আয়তসুন্দর ভ্রুযুগল, মনোমোহন নয়নদ্বয়। তোমার ওই মোহনীয় আঁখি যুগল অপেক্ষা এজগতে তেমন আর অন্য কোন প্রিয়তর বস্তু আমার নেই।"

"হে যুবক, তুমি বিভ্রান্ত হয়েছো, বিপথগামী হয়েছো। তুমি নভোস্থিত চন্দ্রকে ক্রীড়ানক করতে অভিলাষী। সুমেরু উল্লঙ্ঘনের প্রত্যাশী" আশ্চর্য, বুদ্ধকন্যাকে কামনা করছ!

স্বর্গ-মর্ত্যে এমন কিছু নেই, যা আমার কামতৃষ্ণার উদ্রেক করতে সক্ষম। এ কামতৃষ্ণা যে কিরূপ তাও জানি না। হস্ত হতে দূরে নিক্ষিপ্ত জ্বলন্ত ইন্ধন অথবা প্রক্ষিপ্ত বিষপাত্রসম তা অন্তর্হিত হয়েছে। আর্যমার্গের মাধ্যমে তা সমূলে উৎপাটিত হয়েছে।

যে নারী অনভিজ্ঞ, পঞ্চস্কন্ধ অজ্ঞাত, ধর্মদর্শন করেনি, প্রমাদগ্রস্ত, সেরূপ নারীকে প্রলুব্ধ করতে পার। আমি কিন্তু প্রবুদ্ধা বুদ্ধশ্রাবিকা। এ কারণেই তুমি ধ্বংস হবে, বিধ্বস্ত হবে। মহা দুঃখে নিমগ্ন হবে।

নিন্দা-স্তুতি, ইষ্টানিষ্ট, সুখ-দুঃখ সকল অবস্থায় আমি স্মৃতিমতী। অষ্ট লোকধর্মে আমি অবিচলিত। জগৎ অনিত্যময়, লোভ-দ্বেষ-মোহ বড় অনর্থকর, কামতৃষ্ণা প্রপঞ্চময়-দুঃখময়, এসব আমি সম্যক্ জ্ঞাত আছি, তাই তৎপ্রতি আমি সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত।

আমি আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গারূঢ়া, নির্বাণগামিনী বুদ্ধশিষ্যা। এখন আমি সুখ-দুঃখের অতীত, কামরাগ-হীন, তৃষ্ণা-মুক্ত। তাই শূন্যাগারে আমি অভিরমিত হই। নির্জন বাসেই আমি তৃপ্ত, আনন্দিত।

সুচিত্রিত কাষ্ঠ পুত্তলিকা সূত্র ও কীলকাবদ্ধ হয়ে বিচিত্র-মনোরম নৃত্যভঙ্গী প্রদর্শন করলে। সূত্র ও কীলক অপসারিত হলে পুতুল তখন বিকল, ছিন্নভিন্ন ও খন্ড-বিখন্ড হয়ে যায়। তখন এর কোন্ অংশ তোমার মনোরঞ্জন করবে?

চিন্তা করে দেখ, আমার দেহও সেরূপ। এ দেহ বত্রিশ প্রকার ঘৃণ্য পদার্থের সমষ্টি মাত্র। পৃথিবী-আপ্-তেজ-বায়ু এ চার মহাশক্তির সমবায়ে এদেহ প্রবর্তিত হয়। এ চার ধর্মের অপ্রবর্তনে এ দেহ বিকল হয়, অচল হয়।

এ দেহ ব্যবচ্ছেদ করে স্নায়ু, অস্থি, অন্ত্র, প্লীহা, ফুস্‌ফুস্, হৃৎপিণ্ড প্রভৃতি ৩২ প্রকার ঘৃণ্য পদার্থের এক এক অংশ যখন পৃথক করা হবে, তখন দেহ নামক কিছু কি বিদ্যমান থাকবে? বল? কোন্ অংশ তোমার মনোরঞ্জন করবে? তখন দেহের যা রূপ-লাবণ্য, চক্ষুর সৌন্দর্য, এর কোনও অস্তিত্ব থাকবে কি?

ভিত্তিগাত্রে সুদক্ষ চিত্রকরের তুলিচালনায় অঙ্কিত অপরূপ রূপ-লাবণ্যবতী রমণীর চিত্র দেখে জীবন্ত নারী মনে করে অনুরাগ রঞ্জিত বিপরীত সংজ্ঞা উৎপন্ন করলে তা নিরর্থক মিথ্যা সংজ্ঞা নয় কি? বিড়ম্বিত হওয়া নয় কি? স্বপ্নে সুবর্ণবৃক্ষ দেখে অথবা ইন্দ্রজালের প্রভাবে প্রদর্শিত অত্যাশ্চর্য বিষয়কে সত্য মনে করা অন্ধতা ও অজ্ঞানতা নয় কি?

আমার দেহ, রূপ ও চক্ষুর অবস্থাও তাদৃশ। চক্ষুর স্বরূপ এবং এর প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে তুমি অজ্ঞাত। তাই আমার চক্ষু দেখে তুমি মুগ্ধ ও লালসায় অভিভূত হয়ে পড়েছ। তা তোমার একান্তই মোহান্ধতা। চক্ষু কিরূপ পদার্থ তা শোন-চক্ষু হল বৃক্ষ কোটরে স্থাপিত লাক্ষাগুটিকার মত। চক্ষুকোটরে উদ্ভূত-জলবুদ্বুদ সদৃশ, অশ্রুবাহী-অক্ষিগৃথের জনক, সপ্ত পটলযুক্ত বুদ্বুদ বা পিন্ডমাত্র। এ মিশ্রপিন্ডই চক্ষু, তা আর অন্য কিছুই নয়, দুর্গন্ধবাহী ঘৃণিত অশুচি মাত্র। এরূপ চোখের প্রতি তুমি মোহগ্রস্ত, তৃষিত ও লালায়িত।" এ বলে চারুদর্শনা নারী নির্বিকার চিত্তে স্বহস্তে স্বীয় একটি চক্ষু উৎপাটন করে যুবকের হস্তে দেবার সময় বললেন– "হে আসক্ত যুবক, নাও, তোমার আকাঙ্খিত চক্ষু নাও।"

তখন যুবকের কণ্ঠে আতঙ্ক, বিস্ময় ও ক্ষোভ মিশ্রিত বিকট স্বর ধ্বনিত হল। অন্তর্হিত হল তার কাম লালসা। বলল আর্ত কণ্ঠে "ব্রহ্মচারিণী, আমায় ক্ষমা কর। শীঘ্রই তুমি আরোগ্য লাভ কর। এরূপ অন্যায় আমি আর করবো না। তোমার মত অসদৃশা শুদ্ধ-চারিণীর প্রতি অপরাধ করে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি আলিঙ্গন বা বিষধর সর্পকে স্পর্শ করার মত দারুণ দুঃখের কারণ উৎপন্ন করেছি। তোমার স্বস্তি হোক, আমায় ক্ষমা কর।" এ বলে ধূর্ত যুবক বিরাট মর্মবেদনা নিয়ে বিমর্ষ বদনে দ্রুতপদে সেখান হতে পালিয়ে গেল। (পরমাথদীপনী)

(২)

'রাজগৃহ' প্রাচীন ভারতের সুপ্রসিদ্ধ নগর। এ ঐশ্বর্যপূর্ণ নগরই ছিল মগধরাজ বিম্বিসারের রাজধানী। গিরিশোভিত পূর্ণ্যতীর্থ এ রাজগৃহ শাক্যমুণি বুদ্ধের সাধনাক্ষেত্র। পবিত্র ভিক্ষু সমাকুল কাষায়দীপ্ত রাজগৃহে বিম্বিসার নির্মিত ইতিহাস প্রসিদ্ধ 'বেণুবন বিহার' ভিষক্‌শ্রেষ্ঠ জীবক নির্মিত 'আম্রকানন বিহার' বিরাজমান ছিল। তথাগত বুদ্ধ জীবনে বহুবার বুদ্ধকৃত্য সম্পাদন মানসে সশিষ্য এ পুণ্যপূত স্থানে সমাগত হয়েছিলেন এবং প্রয়োজনানুরূপ তথায় অবস্থান করেছিলেন।

এ রাজগৃহে বিত্তশালী এক পন্ডিত ব্রাহ্মণ অবস্থান করতেন। তাঁর এক 'বিদুষী' বুদ্ধিমতী ও শীলবতী কন্যারত্ন ছিলেন। নাম–'শুভা'। মেয়েটি মনোরমা ও সুশোভনা হেতু তাঁর নামকরণ করা হয় 'শুভা'। তাঁর অন্তর যেমন শোভন ও মধুর, আচরণও ছিল শোভন-মোহন। তাঁর

এ শিব-সুন্দর চিত্ত বহু অতীতকাল হতেই সুসংস্কৃত, সুসমৃদ্ধ ও সুসংঘঠিত হয়ে আসছে। তাঁর পরম সৌভাগ্য যে তিনি কয়েকজন অতীত বুদ্ধের সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন এবং দান-শীল-ভাবনারূপ অক্ষয় সুকৃতি সঞ্চয় করেছিলেন। এ মহাকুশলই তাঁর তৃষ্ণা-ক্ষয়ের পথ সুগম করেছিল।

জন্মান্তরের শক্তিশালী পুণ্যসংস্কার তাঁকে উদ্বুদ্ধ করল। কুশল কর্ম সম্পাদনে তিনি আত্মনিয়োগ করলেন এবং প্রীতিফুল্লমনে পুণ্য সঞ্চয় করতেন। তৎপ্রতি তাঁর উৎসাহ সমধিক। বিদ্যাবত্তা ও বুদ্ধিমত্তা তাঁকে মহীয়সী করে তুলেছিল। তাঁর চিত্ত বিরাগ প্রবল। অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম এ আধ্যাত্মিক বিষয়ক্রয় তিনি গভীরভাবে চিন্তা করতেন। ত্রিলক্ষণ জ্ঞানই তাঁর চিত্তে ভাবান্তর এনে দিয়েছিল। তিনি যৌবনে পদার্পণ করলেও বিলাস-ব্যসনের প্রতি ছিলেন উদাসীন। জাগতিক দুঃখ তাঁর মনে ভীতির সঞ্চার করেছিল। দুঃখের উৎস তৃষ্ণার ক্ষয় সাধনের একমাত্র উপায় বিরাগ, তা জ্ঞাত হয়ে সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হলেন। উদ্বিগ্ন হলেন তিনি সংসার ত্যাগের জন্য।

এক সময় ভিক্ষুণী মহাপ্রজাপতি গৌতমীর সাথে বিরাগিণী শুভার সাক্ষাৎ হল। গৌতমীর উপদেশ তাঁর মর্মস্পর্শ করল। তিনি আকুল হয়ে পড়লেন বুদ্ধশাসনে প্রব্রজ্যা লাভের জন্য। মাতা-পিতার অনুমতি নিয়ে তিনি গৌতমীর নিকট প্রব্রজ্যা ধর্মে দীক্ষা নিলেন। অন্তর্দৃষ্টির অনুশীলনে তিনি কৃত কৃতার্থ হলেন। অচিরে অনাগামী ফল লাভ করলেন। কামরাগ ও ক্রোধের নিরবশেষ নিরোধ হল। চিত্ত শান্ত হল, অনুপম প্রীতিরসে হৃদয় প্লাবিত হল।

শুভার করণীয় এখনও শেষ হয়নি। মান, ভবরাগ ও অবিদ্যার মূলচ্ছেদ করতে হবে। নির্জন সাধনার প্রয়োজন। তজ্জন্য তিনি প্রয়াস ও যত্নবতী হলেন। নির্জন তাঁর অতি প্রিয়, নির্জনেই শান্তি, নির্জনেই তিনি অভিরমিত হন।

(৩)

একসময় পুণ্যলক্ষণ বিমন্ডিত তথাগত বুদ্ধ রাজগৃহে জীবকের 'আম্রকানন বিহারে' সশিষ্যে অবস্থান করছিলেন। ভিক্ষুণী শুভাও ছিলেন তথায় ভিক্ষুণীদের আবাসে। প্রায় সময় তিনি আম্রকুঞ্জের নির্জন

প্রদেশে একাকিনী দিবাভাগ অতিবাহিত করতেন; তথায় গভীর ধ্যানে নিবিষ্ট হতেন।

একদিন শুভা মধ্যাহ্নে আম্রকাননের নির্দিষ্ট নির্জন স্থানের উদ্দেশে যাচ্ছিলেন। কিছুদূর যাওয়ার পর দেখলেন এক নির্জন স্থানে এক তরুণ যুবক। তাঁর প্রতি লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। সে শুভার সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়েছে এবং তীব্র লালসায় বিমূঢ় হয়ে পড়ছে। তাঁর গমন পথ সে রুদ্ধ করে দাঁড়াল।

শুভা বিমর্ষ হয়ে গভীর স্বরে বললেন– "পথ ছাড়ো।"

মৃদু হাস্যে যুবক বলল– "তা হবে না, পথ ছাড়তে পারবো না।"

(৪)

শুভা ত্রিলক্ষণ ভাবনায় চিত্ত নিবিষ্ট রেখে উৎপাটিত চক্ষুস্থলের বেদনা সহ্য করতে লাগলেন। তিনি ধীর-পদবিক্ষেপে আম্রকানন বিহারে প্রত্যাবর্তন করলেন। সর্বদর্শী বুদ্ধের নিকট তিনি উপনীত হয়ে বুদ্ধের এবং তাঁর দেহের মহাপুরুষ লক্ষণসমুহ অগাধ শ্রদ্ধা ও প্রীতিনেত্রে দর্শন মাত্র তাঁর হৃতচক্ষু পুনঃ প্রাপ্ত হলেন। শুভা তখন বিস্ময়ানন্দে অভিভূত হলেন। বুদ্ধগত প্রীতিতে তাঁর সর্বশরীর স্ফুরিত হল। তিনি স্থিতাবস্থায় অপলক প্রীতিনেত্রে পুণ্যপুরুষ তথাগতের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে দাঁড়িয়ে রইলেন। এমতাবস্থায় দিব্যদর্শী বুদ্ধ তাঁর চিত্তভাব পরিজ্ঞাত হয়ে তাঁর চিত্তানুরূপ ধর্মদেশনা করলেন। দেশনার মাধ্যমে শিক্ষা দিলেন সর্বোচ্চ জ্ঞান লাভের উপায়। বুদ্ধের উপদেশের সঙ্গে সঙ্গেই গভীর অভিনিবেশ সহকারে অন্তর্দৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠিত হলেন। সৌভাগ্যবতী শুভার মনোবাসনা পূর্ণ হল। অমৃত-নির্ঝর নির্বাণ সাক্ষাৎ করে অনির্বচনীয় নৈর্বাণিক সুখে সুখী হলেন তিনি।

(পরমার্থ-দীপনী)